হিমতীর্থ

সুকুমার রায়

প্রথম প্রকাশ
২৯শে মাঘ, শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৫
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

প্রকাশক
শ্রীঅনাদিনাথ নান
৫৩এ, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীনির্মল দত্ত

ব্লক ও মুদ্রণ
দি ক্যালকাটা ফটোটাইপ কোং (প্রাইভেট) লি:
কলিকাতা—১৩

মুদ্রাকর
শ্রীসুনীল কুন্দগ্রামী
গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাইভেট) লি:
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলিকাতা—১৬

পরিবেশক
জ্ঞান-সঞ্চয়
৭১/১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
১১৯, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা—২৫

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

সুদীর্ঘ ও সুপ্রাচীন পর্বতমালা হিমালয়। চিরদিনই শৈলশ্রেষ্ঠ হিমগিরি পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক রূপে ভারতবাসীর কাছে গণ্য হয়ে আসছে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল থেকে সুরু করে হিমাঞ্চল পর্যন্ত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সকল সম্প্রদায়েরই শত শত তীর্থ আর দেবদেউল ছড়িয়ে আছে। যুগযুগ ধরে মানুষ হিমালয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছে আজও তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটেনি। হিমালয় মানুষকে ডাকে। তার ডাকে যাদু আছে। সে যাকে ডাকে, ঝড়, ঝঞ্ঝা, আপদ-বিপদ, কঠিন চড়াই-উৎরাই, গভীর অরণ্য, হিংস্র জন্তু জানোয়ার, বরফ, হিমবাহ ইত্যাদি সব কিছুকেই উপেক্ষা করে তাকে ছুটে যেতে হয় হিমালয়ে। ওর ডাকে মানুষ ঘর ছাড়ে, দুঃখ পায়, কষ্ট পায় পরিশেষে পায় অমৃত আনন্দ আর শান্তি। হিমালয়ের সান্নিধ্যে এলে প্রতিটি মানুষের অন্তর এক ঐশিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সেখানকার প্রকৃতির মধ্যে বসে মানুষ অন্তরের সঙ্গে অনুভব করে দেবতাকে।

হিমালয়ের ডাকে, হিমতীর্থ কেদারনাথ ও বদরিনাথকে উপলক্ষ্য করে পিঠঝুলি কাঁধে তুলে নিয়ে সেদিন আমিও বিপুল আগ্রহে ছুটে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে হিমালয়ের বর্ণনা, তার তীর্থপথের সুখদুঃখের কথা লিখব এমন ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু শ্রীমতী লিলি দেবীর ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বাধ্য হয়ে লিখতে হয় হিমতীর্থ ভ্রমণকাহিনী।

"ভারততীর্থ" মাসিক পত্রিকায় "কেদারনাথ ও বদরিনাথ ভ্রমণকাহিনী" নামে ধারাবাহিক ভাবে এই কাহিনীটি প্রকাশিত হয়। "হিমতীর্থ" সেই প্রকাশিত রচনার পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পূর্ণতর রূপ। যাঁর অনুরোধে এর প্রথম সূচনা, সর্বাগ্রে তাঁকেই জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

হিমালয় প্রেমিক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

গ্রন্থটি প্রকাশ মুহূর্ত পর্যন্ত নানা বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন হিমালয় পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হত না। তাই তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ নান মহাশয়ের ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও সহায়তা পেয়ে মনে হয়েছে যে, তিনি কেবল প্রকাশকের কর্মভার নিয়েই ক্ষান্ত হননি, বন্ধুর মত পাশেও ছিলেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন শিল্পী শ্রীযুক্ত নির্মল দত্ত, প্রুফ সংশোধন করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী এবং আলোকচিত্রগুলো শ্রীযুক্ত অরুণকুমার গুহরায়, শ্রীযুক্ত অমিতাভ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সমীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের তোলা। এঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন।

"হিমতীর্থ" পড়ে যদি কোন পাঠক-পাঠিকা আনন্দ পান, কিংবা কেদারনাথ ও বদরিনাথ তীর্থ পরিক্রমার বাসনা অন্তরে জাগে, তবেই সার্থক হবে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, সফল হবে আমার এ শ্রম। ইতি—

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৫
৪২এ, রামকমল স্ট্রীট
খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩

লেখক

মা ও বাবাকে

ভূমিকা

আমার তরুণ বন্ধু শ্রীমান্ সুকুমার রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়। বিগত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আমার কৈলাস ও মানসসরোবর যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। অতঃপর টনকপুর থেকে অগ্রসর হয়ে মায়াবতী আশ্রম ঘুরে যখন প্রায় একশ মাইল পেরিয়ে পিথোরাগড়ে গিয়ে পৌঁছাই, সেইখান থেকে সুকুমার আমাদের সঙ্গী হন্। দুস্তর পাহাড় পর্বতের পথে আমাদের বন্ধুত্ব কেবল যে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাই নয়,—বহু দুরতিক্রম্য অঞ্চলে সুকুমারের উদ্দীপনা অধ্যবসায় শ্রমশক্তি এবং কষ্টসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে আমরা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেছিলুম। মনে হয়েছিল পাহাড় পর্বত এবং অজানা অগম্য অঞ্চলে তাঁর মতো সঙ্গী পাওয়া বিশেষ আনন্দের বিষয়। তিনি কুমায়ুনের নানা পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন এটি জেনেও খুশী হয়েছি।

কৈলাস যাত্রার কিছুকাল আগে সুকুমার গিয়েছিলেন কেদার-বদরি তীর্থ ভ্রমণে। এই ভ্রমণ এখন আর তেমন দুঃসাধ্য নয়। যানবাহনাদির প্রাচুর্য এবং আহার্য বস্তুর সুলভতা ইদানীং কেদার-বদরি তীর্থযাত্রাকে অনেকটা সহজসাধ্য করে তুলেছে। প্রতি বছরেই এই পথে লোকের ভীড় বেড়ে চলেছে. এবং নানাশ্রেণীর লোকের চোখও এদিকে পড়েছে। কিন্তু এই সমগ্র পথটি এখনও নদী পর্বত কান্তার বন তপোবন মিলিয়ে মানুষের মনে যে ঔৎসুক্য এবং আকর্ষণ এনে হাজির করে, সুকুমার সেকথাটি ভোলেননি। সেই কারণে তাঁর ছোট ছোট মনোজ্ঞ বর্ণনার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর আনন্দবোধকে বিতরণ করার চেষ্টা পেয়েছেন। এই পথে প্রায় সাতাশ বছর আগে আমি গিয়েছিলুম, এবং এই দীর্ঘকাল ধ'রে এই পথে যে কেউ গেছে, তাকেই যেন অনেকটা বন্ধুর মতো মনে হয়েছে। যাদের পায়ে পাথর ফোটেনি, কপালের ঘাম ঝরেনি. ধুলোয় যন্ত্রণায় মালিন্যে অধাশনে—সমস্ত চেহারাটা যাদের শুকিয়ে ওঠেনি, তাদের বোঝানো যাবে না, এই পথের প্রকৃত আনন্দ কেমন! কিন্তু সুকুমারের এই রচনাগুলির মধ্যে সেই একাগ্র আনন্দের স্বাদ আছে। এই ছোট বইটি যদি ভবিষ্যৎ কেদার-বদরি যাত্রীদের কাজে লাগে, তাহলে সুকুমারের মতো আমিও আনন্দ পাব।

প্রজাতন্ত্র দিবস
জানুয়ারী ২৬, ১৯৫৯

প্রবোধকুমার সান্যাল

হিমতীর্থ

বহুদিনের ইচ্ছা একবার ভারতের উত্তরদিকে হিমালয়ের তুষারের মধ্যে যে সব তীর্থ শত-সহস্র বৎসর ধরে কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় আকর্ষণ করছে সেগুলো পরিভ্রমণে যাই, কিন্তু সে ইচ্ছা আর পূরণ হয় না। অথচ আমার ভিতরের ভ্রমণ বিলাসী মনটা বারে বারে আমায় তাগাদা দেয় ঐ দুর্গম পথের পথিক হতে। কেদার-বদরি ভ্রমণের বই যতবার পড়ি, ছবি যতবার দেখি ইচ্ছা যেন তত বেশী করেই আমায় আঁকড়িয়ে ধরে, অবশেষে একদিন সত্যিই ঠিক করে ফেলি—এবার কেদার বদরি পরিক্রমায় যাবই। আত্মীয় স্বজন যাঁরা আমার ইচ্ছার কথা শুনলেন তাঁরা কেউই কোন উৎসাহ বাণী শোনালেন না। আমি কিন্তু নিরাশ হলাম না। সঙ্গী কেউ তেমন জুটলো না—একাই যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম, যাত্রার যখন মাত্র একদিন বাকী এমন সময় বন্ধু পঞ্চা এসে উৎফুল্লচিত্তে জানালো—সে আমার সঙ্গী হবে। অতিমাত্রায় আনন্দিত মনে আমি তাকে গ্রহণ করলাম। দুর্গম পথ, অনেক দিনের রাস্তা, একেবারে একা যেতে হবে না ভেবে আনন্দও হলো।

১৯৫৩ সাল ৮ই মে, দেরাদুন এক্সপ্রেসে যখন চেপে বসলাম তখন মনটা কিছুক্ষণের জন্যে বেশ খারাপ হয়ে গেল। চার পাশে ভিড়ের কলগুঞ্জনের মধ্যেও কেমন যেন একলা বোধ করতে লাগলাম নিজেকে। কিছুক্ষণ মাত্র, তারপর সব ঠিক। যারা জন্ম অভিযাত্রী—পথের নেশায় যারা পাগল—ঘরের মায়া তাদের বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না।

হরিদ্বারে যেদিন এসে পৌঁছলাম মনে হলো যেন পথের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছি। বেশ খানিকটা আনন্দ নিয়েই বেরোলাম শহর পরিভ্রমণে। হরিদ্বার প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসতেই রিক্সাওয়ালার দল আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। 'হর-কি-পারি' পর্যন্ত রিক্সার ভাড়া আট আনা। স্টেশন থেকে 'হর-কি-পারি'র দূরত্ব মাইলখানেক। ঠিক করলাম এই মাইলখানেক পথ রিক্সায় না চড়ে হেঁটেই যাব। পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি আর মাঝে মাঝে আস্তানার জন্যে ধর্মশালাগুলোতে সন্ধান করছি, খালি আছে কিনা? কোন জায়গায় তেমন আশার বাণী শোনা গেল না। তবে কি পথে পথেই কাটাতে হবে নাকি? তা মন্দ হয় না, দুই বন্ধুতে কথা বলতে বলতে কখন যে 'হর-কি-পারি'র ঘাটের কাছে চলে এসেছি খেয়ালও নেই। এখানেই হরিদ্বার প্রবাসী এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, ভদ্রলোকটিকে আস্তানার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি "ভোলানন্দ গিরির" ধর্মশালায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। তার কথামত বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে হাজির হলাম "ভোলানন্দ গিরি" আশ্রমে।

কলস্বনা জাহ্নবীর তীরে এ আশ্রম। এখানে ভোলানন্দ গিরির ধর্মশালাও আছে। ধর্মশালা ও আশ্রমের ব্যবধান অতি অল্প। সমস্ত আশ্রমটাই গেরুয়া রঙে ছোপানো, আশ্রমবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদও গেরুয়া রঙের। এখানকার পরিবেশই যেন আলাদা। আশ্রমের স্বামীজীরা সকলে সাধন ভজন নিয়েই আছেন। কল্যাপ্‌সিব্‌ল্ গেট্ দিয়ে ঢুকতেই নাটমন্দির। আমরা যখন আশ্রমে ঢুকলাম তখন একজন স্বামীজী কয়েকটি ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে নাটমন্দিরের উপর বসে ধর্মগ্রন্থ

থেকে কি জানি পাঠ করছিলেন। মন্দিরের ভিতর মহাত্মা ভোলানন্দ গিরির প্রস্তরমূর্তি ও শিবলিঙ্গ বিরাজমান। মন্দিরের পাশে আশ্রম অধিকর্তার ঘর। আমরা সোজা গিয়ে আশ্রম অধিকর্তাকে আমাদের সবকথা খুলে বললাম। আমরা ড়ু'জনে কেদার-বদরি যাচ্ছি শুনে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন, এবং তখুনি অন্য একজন স্বামীজীকে ডেকে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে বললেন। স্বামীজী আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে চললেন। উঁচু দালানের উপর স্থন্দর স্থন্দর পাকা কুটীর। এইসব কুটীরে অর্থাৎ ঘরে স্বামীজীরা থাকেন। স্থন্দর ব্যবস্থা, চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখলাম, অনেক কুটীর আবার খালি পড়ে আছে। স্বামীজী আমাদের ঐরূপ একটি কুটীরের তালা খুলে দিয়ে বললেন, আপনারা এইখানেই থাকুন।

পরদিন সকালে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে স্নানের জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। আশ্রমের সামনেই বিড়লা ঘাট। কয়েক বৎসর হলো বিড়লা বহু অর্থব্যয়ে এই স্থন্দর ঘাটটি তৈরী করিয়েছেন। বাজারের মধ্যে দিয়ে ড়ু'সারি রকমারি জিনিসের দোকান দেখতে দেখতে 'হর-কি-পারি'তে পোঁছে গেলাম।

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের বিধি। তীর্থযাত্রী ও ধর্মপ্রাণ নরনারীগণ হরিদ্বারে এসে প্রথমেই ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে স্নান করেন। কারণ এই ক্ষেত্রের মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ডই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ স্থান। প্রবাদ, প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এই স্থানে আবির্ভূত হন। তাই এই স্থান হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র স্থান। শুধু কি তাই? পৌরাণিক মতে, বহু জন্মের পুণ্যের ফলে মানুষের কপালে হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান ঘটে। শাস্ত্রেও আছে, হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান মানুষের কপালে বড়ই ড়ুর্লভ!

"সর্বত্র স্থলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু ড়ুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গা সাগর সঙ্গমে॥"

আমার কপালেও যখন এই পবিত্র হরিদ্বার তীর্থের ড়ুর্লভ গঙ্গায়

স্নানের সুযোগ ঘটেছে তখন আমিই বা এই অমূল্য সুযোগ ছাড়ি কেন? জলে স্নান করতে নামবার আগে স্পর্শ করে দেখি, জল বরফের মত ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডায় আর স্নান করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। অথচ এই দুর্লভ স্নানের লোভও সংবরণ করতে পারছিলাম না। দেখি, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই মহানন্দে এই বরফ গলা জলে স্নান করছে। গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করে আমিও জলে নেমে পড়লাম। কোথায় শীত? শীত ততক্ষণ আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে।

এখানে বেশীর ভাগ যাত্রীই পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে স্নান করে থাকে। শাস্ত্রমতে এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের মাহাত্ম্য বেশী। ব্রহ্মকুণ্ডকে অনেকের পৃথক কুণ্ড বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। গঙ্গার একটি ধারা কুণ্ডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। কুণ্ডের তলা ইট দিয়ে বাঁধানো। স্রোতের জল কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে আবার যাতে মূল গঙ্গায় গিয়ে মিশতে পারে তারও ব্যবস্থা করা আছে। পতিতপাবনী গঙ্গা এই কুণ্ডের মধ্যে আবর্তিত হয়ে প্রবলবেগে ছুটে চলেছে। স্ত্রীলোকদের স্নানের সুবিধার জন্যে কুণ্ডের একদিক লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই কুণ্ডের দৃশ্য অতি মনোরম। পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ডের স্নানের ঘাট খুবই ছোট ও অপ্রশস্ত ছিল। পালপার্বণে এই অপ্রশস্ত ঘাটে অনেক দুর্ঘটনা ঘটতো বলে তদানিন্তন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় ডি· বি· উড্ নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে বর্তমান ঘাটটির সৃষ্টি হয়েছে। এখন বিরাট বাঁধানো চত্বর, প্রশস্ত ঘাট। কুণ্ড থেকে প্রায় আধ মাইল দূর পর্যন্ত গঙ্গার তীর ইট দিয়ে বাঁধানো। উত্তর দিকে একটি চড়া, তাও ইট দিয়ে বাঁধানো এবং পুল দ্বারা সংযোগ করা। এই চড়ার মাঝখানে 'বিড়লা টাওয়ার', অর্থাৎ 'ঘণ্টাঘর' প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ঐ ঘণ্টা বাজে। তড়িৎ সংযোগে চলমান এই ঘড়ি।

ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটেই 'কুশাবর্ত' ঘাট। কথিত আছে, পুরাকালে মহর্ষি দত্তাত্রয়ের কুশ একবার গঙ্গা-স্রোতে ভেসে যায়। তখন তিনি তপস্যার বলে গঙ্গার স্রোতকে প্রত্যাবর্তন করিয়ে পুনরায় নিজ কুশ ফিরিয়ে

আনেন্। যাত্রীরা এই কুশাবর্ত ঘাটে পিণ্ড, শ্রাদ্ধাদি, কার্য করেন এবং মন্ত্রোচ্চারণ করে মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দেন। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের উপর মন্দিরের মধ্যে গঙ্গাদেবীর মূর্তি এবং বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন পূজিত হয়। পুরাণোক্ত ব্রহ্মার যজ্ঞ-স্থলে 'হরি-কি-চরণ পৈরী' মূল প্রস্তরটি কালক্রমে জলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায়। বর্তমান চরণ চিহ্নটি তারই নব সংস্করণ।

হরিদ্বারের সন্ধ্যাকালীন দৃশ্য অপূর্ব। বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মকুণ্ড নয়নরঞ্জন শ্রী ধারণ করে। মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজতে থাকে। মহাসমারোহে দীপাবলীর সাহায্যে গঙ্গার আরতি হয়। এই সময় ধর্মপ্রাণ ভক্তযাত্রীর দল কুণ্ডের চারিদিকে বসে সুর করে গঙ্গার বন্দনা গায় এবং অনেক যাত্রী ব্রহ্মকুণ্ডে দীপ ও ফুলের দোনা ভাসিয়ে দেয়, তখন এই কুণ্ডটি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে। সন্ধ্যার এই অপূর্ব দৃশ্য দেখলে রসিকের তো বটেই, অরসিকেরও হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যায়।

শৈবতীর্থ কেদারনাথ ও বৈষ্ণবতীর্থ বদরিনাথের অন্যতম প্রবেশপথ এই হরিদ্বার। তাই শৈবেরা এই স্থানের নাম দিয়েছেন, 'হরদ্বার' আর বৈষ্ণবেরা এই স্থানকে বলেন 'হরিদ্বার'। হরিদ্বার গঙ্গার প্রথম যাত্রাপথে অবস্থিত বলে অনেকে আবার এই স্থানকে 'গঙ্গাদ্বার'ও বলে থাকেন। হরিদ্বারের প্রাচীন নাম কিন্তু 'মায়াপুরী'। এই নামকরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, শিবপত্নী সতী এই স্থানে তাঁর মায়িক দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তদবধি এই স্থান মায়াপুরী নামে সুপরিচিত। পরিবর্তনশীল জগতে প্রাচীন নাম মায়াপুরী পরিবর্তিত হয়ে নাম হয়েছে 'হরিদ্বার'।

হরিদ্বার থেকে দেড় মাইল দূরে কন্খল্। এইখানে সত্যযুগে দক্ষ রাজা শিবহীন যজ্ঞ করেছিলেন। কন্খলে গঙ্গাতীরে দক্ষরাজ প্রতিষ্ঠিত দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির আছে। দক্ষরাজ-ভবনের ভগ্নাবশেষ এখনও দক্ষরাজার স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে। দক্ষেশ্বর শিবের মন্দিরের সামনে সতীঘাট। প্রজাপতি দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে এসে পতি-

পরায়ণা সতী পতি নিন্দায় ব্যথিতা হয়ে পিতার যজ্ঞকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করেন। দক্ষেশ্বর শিবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কিছু দূরে এই সতীকুণ্ড অবস্থিত।

কন্‌খলে গঙ্গা ত্রিধারায় প্রবাহিতা। এখানকার জলের রঙ নীলাভ। তাই এখানকার গঙ্গার স্রোতকে লোকে নীলধারা বলে থাকে। পুণ্যার্থী যাত্রীরা কন্‌খলে এসে স্নান করে। এই তীর্থের এমনি মাহাত্ম্য যে, খল-ব্যক্তিও যদি কন্‌খলের নীল ধারায় স্নান করে তাহলে সেই ব্যক্তি খল স্বভাব বিমুক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করে।

'হর-কি-পারি'র ধার দিয়ে কিছু দূর গেলে 'ভীমগোড়া' তীর্থ পড়ে। ভীমগোড়া নতুন শহর। ভীমকুণ্ড নামে এখানে আর একটি কুণ্ড আছে। প্রবাদ, ভীমের অশ্ব-খুরাঘাতে এই কুণ্ডের উৎপত্তি। এখানে গঙ্গার দু'পারে অর্থাৎ দক্ষিণে ও উত্তরে দু'টী পাহাড়ে মনসাদেবী ও চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে। এই দুই দেবীর নামেই পাহাড় দু'টোর নামকরণ হয়েছে মনসাপাহাড় ও চণ্ডীপাহাড়। চণ্ডীপাহাড় সম্বন্ধে এখানে এক জন-প্রবাদ শোনা যায় যে, প্রতিরাত্রে এক বৈয়াঘ্রদেব চণ্ডীদেবীর দর্শনে আসেন।

আশ্রমের আধিকর্তা-ও অন্যান্য স্বামীজীদের থেকে বিদায় নিয়ে বেলা তিনটার সময় আমরা আশ্রম থেকে বেরিয়ে পুনরায় স্টেশনের দিকে রওনা হই। আশ্রমের সকলেই আমাদের যাত্রা সুফলের জন্যে আশীর্বাদ করলেন। আশ্রমের পাশ দিয়ে ভোলাগিরি রোড ধরে হরিদ্বার স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। একটু পরেই ট্রেণ ছেড়ে দিল। আমরা দেবভূমি হরিদ্বার ছেড়ে এবার ঋষিভূমি হৃষীকেশের দিকে চললাম।

উত্তরাখণ্ডের পথে হরিদ্বারের পরেই হৃষীকেশ ক্ষেত্রের নাম বিখ্যাত। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশের দূরত্ব চৌদ্দ-পনেরো মাইল; রেলে ও বাসে এই দুই উপায়েই হৃষীকেশ পৌঁছানো যায়। যাত্রীদের পক্ষে দুই-ই

সুবিধাজনক। বাসে গেলে, বাস একবারে শহরের মধ্যে "কালীকম্বলী-ওয়ালার ধর্মশালার" কাছে এসে থামে। আমরা ট্রেণের যাত্রী। রেলপথ ও বাস-পথ প্রায় পাশাপাশি গিয়েছে। পথে মাঝে মাঝে পরস্পর পরস্পরকে কাঁচি কাটার মত অতিক্রম করে চলেছে। ঘণ্টাখানেক পর ট্রেণ এসে হৃষীকেশ পৌঁছল। দেবতার জয়ধ্বনি দিতে দিতে ধর্মপ্রাণ যাত্রীর দল ট্রেণ থেকে নেমে ছুটলো আস্তানার অন্বেষণে। আমরাও যাত্রীদলের পিছু পিছু স্টেশনের বাইরে এসে হাজির হলাম। এক্কা-ওয়ালারা আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। স্টেশন থেকে কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালার দূরত্ব এক মাইল এবং ভাড়া এক টাকা। এক্কায় করে না গিয়ে পিচঢালা পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালার দিকে। এই ধর্মশালা এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। উত্তরাখণ্ডে প্রায় সর্বত্রই কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালা আছে। হৃষীকেশই হলো কালীকম্বলীওয়ালা ধর্মশালার হেড কোয়াটারস্ অর্থাৎ প্রধান আড্ডা। সেই কারণেই বোধ হয়, লোকে এই স্থানকে কালীকম্বলীওয়ালার ক্ষেত্র বলে থাকে। আমরা সরাসরি ধর্মশালায় এসে উঠলাম। বহু বিচিত্র ধরণের যাত্রী একত্রে মিলিত হয়েছে ধর্মশালায়। কেউ চলেছে পুণ্যলাভের আশায়—কেউ ফিরছে পুণ্যসঞ্চয় করে। ওদের মত আমরাও যাত্রী, ধর্মশালায় শুধু রাতটুকুর মত আশ্রয় চাই—তাই সোজা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বললাম, আমাদের থাকার একটু বন্দোবস্ত করে দিন। দুঃখ প্রকাশ করে ভদ্রলোক জানালেন যে, ঘর একটিও খালি নেই।

ম্যানেজারকে বললাম, তাহলে এখন উপায় ?

তিনি একটা উপায় বাতলে দিয়ে বললেন, আমাদের জিম্মায় আপনাদের মালপত্র রেখে যেখানে হোক শুয়ে পড়ুন, রাতটুকু বই তো নয়। যুক্তিটা মন্দ নয়। আর তাছাড়া আমরা যখন যাত্রিক তখন ঘর আর বার আমাদের কাছে দুই সমান। ম্যানেজারের প্রস্তাবটি মেনে নিলাম। আমাদের পিঠঝুলি দুটো ধর্মশালার জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্ত

মনে বেরিয়ে পড়ি পাহাড়তলী হৃষীকেশ শহর এবং প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো দেখতে।

প্রথমেই এসে হাজির হলাম মোটর বাসের আড্ডায়। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে হৃষীকেশ মোটর বাসের একটি প্রধান আড্ডা। এখান থেকে হৃষীকেশ—হরিদ্বার, হৃষীকেশ—লছমন ঝোলা, হৃষীকেশ—কীর্তিনগর ও হৃষীকেশ—ধরাসু প্রভৃতি পার্বত্য পথে বাস যাতায়াত করে।

পার্বত্য পথের বাসগুলো আকারে তেমন বড় নয়। তারপর আবার 'আপার' ও 'লোয়ার' শ্রেণী ভাগ করা ; ভাড়াও সে অনুপাতে কিছু কম বেশী। আগামী কাল যাতে বাসের টিকিট পাওয়া যায় সেই আশায় ছুটলাম বাসের কর্মকর্তার কাছে। ভদ্রলোককে খুঁজে পেতে যা হোক পাওয়া গেল কিন্তু সেই মুহূর্তেই নিরাশ হতে হল ভদ্রলোকের মুখের একটি মাত্র কথায়—টিকিট নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম—ক'দিন আগে আপনারা টিকিট দেন যাত্রীদের ?

একদিন আগে। আর সেই দিনই সব টিকিট শেষ হয়ে যায়। টিকিট না পেয়ে বহু যাত্রীকে বাধ্য হয়ে এখানে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এখান থেকেই যারা হাঁটা পথে যাত্রা সুরু করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বাস চলা অবধি হাঁটা পথে যাত্রী একরকম যায় না বললেই চলে। সেই কারণে বাসের ভীড়টাও বেশী। যার জন্যে যাত্রীদের এই দুর্ভোগ।

আমাদেরও সেই দুর্ভোগচক্রে পড়তে হবে না কি মশাই ?

পথে বেরিয়েছেন—একটু-আধটু দুর্ভোগ তো পোয়াতেই হবে, তা না হলে তীর্থের পথ বলছে কেন, বলুন ?

যাত্রিক হিসাবে পথ চলতে চলতে সব রকম দুর্ভোগ পোয়াতে রাজি আছি, রাজি নই শুধু অলসভাবে হৃষীকেশে দিনের পর দিন বসে সময় নষ্ট করতে।

ভদ্রলোকের কথাবার্তার মধ্যে পেয়েছিলাম একটি রসিকমনের

পরিচয়, তাছাড়া ব্যবহারটিও অমায়িক। ভদ্রলোক বছর কয়েক কাজ করছেন হৃষীকেশে। সেই ক'বছর ধরে নানান দেশের যেসব বিচিত্র যাত্রীর সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের মজার মজার কাহিনী শোনাতে লাগলেন। আমিও খুব মশগুল হয়ে উঠেছি। ব্যাপার দেখে পঞ্চা আমায় ইশারা করে কাজের কথা জানিয়ে দিল। সত্যিই তো এতক্ষণ সেই কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে আবার আমাদের কাজের কথা পেড়ে বসলাম। ভদ্রলোক একটু চিন্তায় পড়লেন। চিন্তার ঘোর কাটিয়ে বললেন, প্রথম যাত্রীবাহী বাসে আপনাদের যদি পাঠাতে না পারি, তবে একটু বেলায় ডাকগাড়ী করে আপনাদের দু'জনকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

তাই সই। তব্ তো অনেকখানি কষ্ট ও সময় বাঁচবে।

তিনি অন্য এক কর্মচারীকে আমাদের দু'জনের নাম লিখে নিতে বললেন। আমরা নাম লিখিয়ে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

সন্ধ্যা হতে তখনও বেশ কিছু সময় বাকি ছিল। বাজারের মধ্যে দিয়ে দু'সারি দোকান দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি গঙ্গার তীরে। হৃষীকেশের গঙ্গার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর, তিন দিকে পাহাড়ের শ্যামলরূপ। আর গঙ্গার ছল্ ছল্ কল্ কল্ অপূর্ব ধ্বনি যে কোন যাত্রীর মনে স্পন্দন জাগায়। সূর্যাস্তরাগে অনুরঞ্জিত গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলো আলোর ফুল্‌কির মত শত-সহস্র হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। ঠিক যেন—

"উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা, ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি।"

স্বর্গলোক থেকে নিভৃত চিরতুষারময় হিমাদ্রির গিরিশৃঙ্গ থেকে বার হয়ে প্রবল বেগে দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে চপলা কুমারীর মত নৃত্য করতে করতে অবিরাম গতিতে প্রতিধ্বনি তুলে মর্ত্যের ভক্তের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার অভিলাষে পতিতপাবনী গঙ্গা ছুটে চলেছে এই পথে। আমরা গঙ্গার তীরে একটি নির্জন স্থানে বসে সেই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। গঙ্গার এই ছল্ ছল্ কল্ কল্ প্রাণময় ধ্বনি শুনে মনে হলো—

"আমি পৃথিবীর শিশু ব'সে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিত ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে।"

গঙ্গার এই অপূর্ব প্রাণময় দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিপটে বিরাজমান। এই সব দৃশ্যাবলী দেখে মনে হতে লাগলো যাত্রার প্রথমেই এই ; না জানি অন্তে কি আছে! আমার মন আর এখান থেকে নড়তে চাইল না। গঙ্গার কূলে বসে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। এতক্ষণ আমার কোন দিকেই খেয়াল ছিল না। পঞ্চা আমায় ধাক্কা দিয়ে বললো, কিরে, তুই এখানেই যে বসে গেলি? চল, শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখি।

সত্যিই এই সুন্দর স্থান ছেড়ে আমার আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা করছিল না। প্রকৃতির কোলে বসে যে বিমল আনন্দ পাওয়া যায় শহরের বিচিত্র কল কোলাহলের মধ্যে সে আনন্দ উপভোগের সুযোগ কোথায়? শহরের বিচিত্র মানুষের পরিবেশের মধ্যে আমার জন্ম। বিচিত্র আচার ব্যবহারের মধ্যে আমি মানুষ। তাই শহরের একঘেয়েমি শুধু আমার কেন, কোন শান্তিকামী লোকের ভাল লাগে না। শহরের কলকোলাহল শুনে শুনে মানুষের সুস্থ মন হাঁপিয়ে উঠে। আমি বললাম, কলকাতা শহর দেখেও কি তোর আশ মেটেনি? কিন্তু আজ এই ত্রিলোক-পাবনী জাহ্নবীর কূলে বসে আমার যে আর শহর ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে না ভাই! তবুও বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরতে হলো। ফেরার পথে শেষবারের মত আর একবার অপলক দৃষ্টিতে দেখে নিলাম হৃষীকেশের গঙ্গার রূপমাধুরী। হঠাৎ

মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে পড়লো, "হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি আমার মানব ভাষা ?"

গঙ্গার তীরে সর্বত্রই পুণ্যার্থী যাত্রীদের ভিড়। কোথাও মাইক্রো-ফোনের সাহায্যে রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। কোথাও আবার সাধু সন্ন্যাসীর দল জপ-তপে বিভোর। এমন অসময় স্নানার্থীর সংখ্যাও কম নয়। এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে এসে হাজির হলাম ভরতজীর মন্দিরে। মন্দিরটি খুবই প্রাচীন। শোনা যায়, রামচন্দ্রের অনুজ ভরত এখানে তপস্যা করেছিলেন। কিংবদন্তী, মহর্ষি দ্বৈপায়ণ এই পবিত্র তীর্থে পবিত্র বেদকে চারিখণ্ডে বিভক্ত করে "বেদব্যাস" উপাধি লাভ করেছিলেন। ভরতজীর মন্দির ছাড়া এখানে আরো দু'একটি প্রাচীন মন্দির আছে। তন্মধ্যে বিষ্ণু মন্দির ও রামচন্দ্রজীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। জনপ্রবাদ, শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে এখানে তপস্যা করেছিলেন। আর্য ঋষিদের তপোভূমি হৃষীকেশের নির্জনতা দেখলে পূর্বের কথাই মনে পড়ে যায়। সাধকদের কাছে হৃষীকেশ যেন স্বর্গ। ভগবৎ চিন্তা ও তপস্যার উপযুক্ত স্থানই বটে।

ধর্মশালায় ফেরার পথে বাজার থেকে বেশ ভাল দেখে দু'জনে দু'টো পাহাড়ে ওঠার লাঠি কিনে নিলাম। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণের সময় লাঠি প্রত্যেক যাত্রীর বিশেষ প্রয়োজন। এখানকার বাজার বেশ বড়। এই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায়।

ধর্মশালায় ফিরে এসে দেখি আরো অনেক নতুন যাত্রীর আবির্ভাব হয়েছে। এখানে কালী কম্বলীওয়ালার ধর্মশালা ছাড়া আরো কয়েকটি ধর্মশালা আছে। থাকলে কি হবে ? সব ধর্মশালাই যাত্রীর অত্যধিক ভিড়ে 'ন স্থানং তিল ধারণং', অবস্থা হয়ে উঠেছে।

রাত্রে খাওয়ার জন্যে এসে হাজির হলাম এক পাঞ্জাবীর হোটেলে। ভদ্রলোক সুদূর পাঞ্জাব ছেড়ে এসেছে এখানে রুজি-রোজগারের জন্যে। কলকাতায় ড্রাইভারী যেমন ওদের একচেটিয়া ব্যবসা এখানেও তেমনি হোটেলগুলো প্রায় সবই পাঞ্জাবীদের। খাওয়া শেষ করে ধর্মশালায়

ফিরে এসে দেখি কলকোলাহল মুখরিত ধর্মশালা একেবারে নিস্তব্ধ। আমরা আমাদের মালপত্র বহন করার জন্যে কোন কুলির বন্দোবস্ত করিনি, নিজেরাই নিজেদের কুলি। শক্তি সামর্থ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পরের অধীনে না যাওয়াই শ্রেয়। তাই নিজেদের ভার সাম্যের জন্যে কিছু মালপত্র একটা বস্তায় বেঁধে আমাদের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখে, ধর্মশালার খাতায় দস্তখত করে ছেড়ে দিলাম ধর্মশালার জিম্মায়। ওরা শুধু আমাদের একটা পরিচয় পত্র দিলেন। ফিরে এসে পরিচয় পত্রটা দেখালে নিজেদের জিনিস ফেরত পাওয়া যাবে। এখানে মালপত্র জমা রাখার জন্যে টাকা পয়সা কিছুই দিতে হয় না। এরা যাত্রীদের সুবিধের জন্যে অনির্দিষ্টকাল অবধি ঐ সব জিনিসপত্র খুব যত্ন করেই রেখে দেন। এইবার মূল সমস্যা দেখা দিল—শুই কোথায়? দেখি ধর্মশালার উঠানের একদিকে একটু খালি জায়গা পড়ে আছে। কোন রকম দ্বিধা না করে উঠানেই কম্বল বিছিয়ে আর একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশের দিকে তাকাতেই দেখি ম্যানেজার তখনও কাজ করছেন। ম্যানেজারের কর্মে নিষ্ঠা দেখে মনে মনে তারিফ করলাম। চুপিসারে উঠে গিয়ে বসলাম ম্যানেজারের পাশটিতে। অনুরোধ করলাম এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলতে। আমার কৌতূহল দেখে ম্যানেজার মহাশয় কিছুক্ষণের জন্যে নিজের কাজ বন্ধ রেখে শোনালেন ধর্মশালার ইতিহাস—কয়েক বছর আগে হৃষীকেশে বিশুদ্ধানন্দ স্বামী নামে এক সর্বত্যাগী সাধু মহারাজ বাস করতেন। সব সময় তিনি সর্বাঙ্গে একটা কাল কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকতেন। তাই লোকে তাঁকে কালী-কম্বলীওয়ালা বলে ডাকত। একদিন ধনকুবের সূরযমল মহাশয় এই তীর্থে ভ্রমণ করতে আসেন এবং কালী কম্বলীওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলাপ পরিচয়ের পর সাধুজীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সূরযমল

জিজ্ঞাসা করেন, সাধুজী আমি কি আপনার কোন উপকারে লাগতে পারি? আপনি দয়া করে যা আজ্ঞা করবেন, আমি সাধ্যমত তা পালন করার চেষ্টা করব। সাধুজী স্বল্পভাষী ছিলেন, কথার চেয়ে কাজই বেশী করতেন, তাই সূরযমলকে মুখে কোন কথা না বলে, তাকে সঙ্গে নিয়ে সমগ্র উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। পথে যাত্রীদের সুবিধে-অসুবিধে সাধুজী সূরযমলকে দেখাতে লাগলেন এবং কোথায় কিরূপ ব্যবস্থা করলে যাত্রীদের কষ্ট লাঘব করা যায় বলে বুঝিয়ে দিলেন। সূরযমল নিজে যাত্রীদের দুরবস্থা দেখে এবং সাধুজীর আদেশানুসারে উত্তরাখণ্ডে সমস্ত তীর্থস্থানে যাত্রীদের সুবিধের জন্যে বাসোপযোগী অনেকগুলো ধর্মশালা তৈরী করিয়ে দেন। ঐ সব ধর্মশালাগুলো সাধুজীর নামানুসারে আজও উত্তরাখণ্ডে সব তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীদের নিকট পরিচিত। কালীকম্বলীওয়ার প্রত্যেক ধর্মশালাতেই সাধু সন্ন্যাসী ও গরীব তীর্থযাত্রীদের জন্যে সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। সমগ্র উত্তরাখণ্ডে কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালাই একমাত্র প্রধান ও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে পিঠঝুলি কাঁধে তুলে নিয়ে একেবারে যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে পড়লাম বাসের আশায়। যদিও আগে থেকেই জানতাম যে, বাসের সব টিকিট বুক হয়ে গিয়েছে, তবুও সকালের বাসে যাওয়ার আশা ছাড়িনি। চেষ্টায় আছি যদি ভাগ্যক্রমে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত দুটো টিকিট পাওয়া যায়। আর যদি না পাওয়া যায় তবে বেলায় হাতের-পাঁচ ডাকগাড়ী তো আছেই। বাস স্ট্যাণ্ডে আমাদের দু'জনকে এদিক—ওদিক ছুটোছুটি করতে দেখে এক বাঙালী ভদ্রলোক ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা বাসের টিকিট পান নি বুঝি?

আজ্ঞে না।

কতদূর যাবেন ?

দেবপ্রয়াগ।

আমাদের বাস দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত রিজার্ভ যাচ্ছে। চলুন না আমাদের বাসে।

যেতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু টিকিট ?

আগেই তো বললাম বাস আমরা রিজার্ভ করেছি। এতে টিকিট লাগবে না!

তা না হয় হলো, কিন্তু টিকিটের দাম……।

দাম ? ও আর আপনাদের দিতে হবে না। চলুন তো এখন।

টিকিটের টাকা আপনারা যদি আমাদের থেকে না নেন, তাহলে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে লাভ নেই।

বেশ, টাকা দেবপ্রয়াগে পৌঁছেই দেবেন।

তথাস্তু! ভদ্রলোকের রিজার্ভ বাসে আমাদের পিঠঝুলি দুটো তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ের পর জানলাম যে তিনি আমার পরিচিত। বয়েজ স্কাউটস্ আন্দোলনে আমরা উভয়ে বহুদিন যাবৎ জড়িত। ডাঃ লোকনাথ ভোস হলো তাঁর পুরো নাম। তরুণ হলেও বয়স আমাদের চেয়ে কিছু বেশী। সেই কারণে আমরা তাকে ডাক্তারদা বলেই ডাকতাম। তিনি আমাদের সঙ্গে আর এক ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। নব পরিচিত ভদ্রলোকটি হলেন কলকাতার কলুটোলার বিখ্যাত মল্লিক বাড়ীর একজন। তিনি সাঙ্গোপাঙ্গো সমভিব্যাহারে বেরিয়েছেন তীর্থ ভ্রমণে।

কেদার-বদরি যাত্রীদের অনেকেই এখান থেকে ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও কুলি দুই মার্গের জন্যে বন্দোবস্ত করে নেয়। এখানে কুলি এজেন্সী আছে ; এজেন্সীতে জানালে তারাই যাত্রীদের জন্যে ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও কুলি ঠিক করে দেয়। তা ছাড়া অন্য কুলিও পাওয়া যায়। উত্তরাখণ্ডের পথে বাইরের কুলি নেওয়ার চেয়ে এজেন্সীর কুলি নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ যাত্রীদের জিনিসপত্র তখন সব কুলি এজেন্সীর দায়িত্বে

চলে যায়। কুলির নাম ও যাত্রীর নাম ইত্যাদি সমস্তই এজেন্সীর খাতায় লেখা থাকে; এতে জিনিসপত্র হারিয়ে যাবার কিংবা জিনিসপত্র নিয়ে কুলির পালিয়ে যাবার কোন ভয় থাকে না। আর যাত্রীরাও নিশ্চিন্ত মনে পথ চলতে পারে। এখানকার কুলিরা সাধারণতঃ গাড়োয়ালী ও নেপালী। এরা সকলেই খুব পরিশ্রমী, বিশ্বাসী ও সরল প্রকৃতির। প্রত্যেক কুলিই প্রায় এক মণের কিছু বেশী পর্যন্ত জিনিস পিঠে নিয়ে পার্বত্য চড়াই-উৎরাই পথে যাতায়াত করতে পারে। কুলিদের টাকাকড়ি রফা হয় জিনিসের ওজন হিসাবে। সের পিছু জিনিসের জন্যে আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা পর্যন্ত কুলিদের দিতে হয়। ডাণ্ডি ভাড়া প্রায় ৩৫০৲ টাকা। কাণ্ডি ভাড়া ১৭০৲ টাকার মত। সময় সময় এদের ভাড়ার টাকার কিছু কম বেশীও হয়।

এই পথে যারা পায়ে হেঁটে চলতে অক্ষম তারাই কেবল ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও ঘোড়া ইত্যাদি করে থাকে। তাছাড়া সবাই পায়েহাঁটা যাত্রী। ডাণ্ডি, আমাদের দেশের পাল্কি বাহকদের মত চারজন বাহক কাঁধে করে নিয়ে যায়। ডাণ্ডিতে একজন চাপলে যাত্রীর কোন অসুবিধে হয় না। একটা ডাণ্ডিতে একজনের বেশী যাত্রী যেতে পারে না। ডাণ্ডি বাহকের সংখ্যা যাত্রীদেহের ওজন অনুপাতে চারজন থেকে ছ'জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডাণ্ডি দেখতে ঠিক কিন্তু আমাদের দেশের পাল্কির মত নয়। পাল্কি আর ডাণ্ডি সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখতে। ছোট নৌকার উপর রিক্সা বসালে যেমন দেখতে হয় ডাণ্ডি কতকটা ঠিক সেই রকম। ডাণ্ডির থেকে কাণ্ডি আর একটু ভিন্ন ধরণের। ডাণ্ডি আর কাণ্ডির পার্থক্য হলো যে, ডাণ্ডির বাহক চারজন, ডাণ্ডিতে চেপে যেতে যাত্রীকে কোন অসুবিধে ভোগ করতে হয় না। আর, কাণ্ডির বাহক একজন। কাণ্ডিবাহকই যাত্রীকে পিঠে মোড়ার মত একটা চুবড়িতে বসিয়ে নিয়ে যায়। এতে খরচ খুব কম লাগে, কিন্তু যাত্রীকে অসুবিধেও অনেক ভোগ করতে হয়। বাহক না থামা পর্যন্ত কাণ্ডির যাত্রীর নড়ন-চড়নের কোন উপায়ই থাকে না। এমন কি এতে সময় সময় পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

যাত্রীরা যে যার সামর্থ ও সুবিধে মত হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কুলি, কাণ্ডি, ডাণ্ডি ও ঘোড়া করে থাকে। পথে প্রধান প্রধান সব জায়গায় কুলি এজেন্সী আছে। এদের কাছে খবর দিলে যাত্রীদের আর কোন অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় না, তবে কিছু অর্থ ব্যয় হয় এই যা।

শোনা গেল বাস ছাড়বে সাড়ে ছ'টায়। যখন ছাড়ে ছাড়ুক—ঐ নিয়ে আর বৃথা চিন্তা করে লাভ নেই। আমার বরাবরই ইচ্ছা যে, যাবার সময় যে পথ দিয়ে যাব ফেরার সময় সেই পথ দিয়ে না ফিরে, অন্য পথ দিয়ে ফিরব। এই রকম ভ্রমণে সব সময় নতুনের আস্বাদ পাওয়া যায়, তা না করে একই পথে যাতায়াত করলে ভ্রমণটা পর্যটকদের কাছে এক ঘেয়ে লাগে। কিন্তু আমাদের আর নতুন পথ দিয়ে ফেরা হবে না, কারণ কিছু জিনিসপত্র এখানকার ধর্মশালায় রেখে যাচ্ছি ফেরার পথে নেবো বলে। বাসের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়? হঠাৎ খেয়াল হলো জিনিসগুলো সঙ্গে নিয়েই চলি—কে জানে, আবার কখন মতিগতির পরিবর্তন হবে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম ধর্মশালার দিকে। তাড়াতাড়ি জিনিসের পরিচয় পত্রটা বার করে ধর্মশালার কর্মকর্তার হাতে দিয়ে বললাম, আমাদের জিনিসগুলো শীগগীর বার করে দিন, বাস এখুনি ছাড়বে। তিনি একজন কর্মচারীকে আমাদের জিনিসগুলো গুদাম থেকে বার করে দিতে আদেশ করলেন। ধর্মশালার জিনিসপত্র জমার খাতায় পেলাম বলে দস্তখত করে বাঁধা অবস্থায়ই থলেটা এনে বাসে তুলে দিলাম। বাস ছাড়ার সময়ও হয়ে এসেছে। বাসের ড্রাইভাররা স্টার্ট দেওয়ার জন্যে সব স্টার্ট লাইনে এসে রেডিস্টেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে "গো"—এই হুকুমের অপেক্ষায়। ছ'টা পঁয়ত্রিশে এক এক করে সব বাস ছেড়ে দিল। বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা মহোল্লাসে কেদারনাথ ও বদরিনাথজীর জয়ধ্বনি দিতে লাগলো। মেয়েরা এক সঙ্গে উলুধ্বনি দিয়ে উঠলো।

এইবার আমরা চলেছি ঋষিভূমি হৃষীকেশ ত্যাগ করে দেবভূমি দেব

প্রয়াগের পথে। আগেই বলেছি, এখানকার বাসের ভাড়া শ্রেণী হিসাবে কিছু কম বেশী। হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগের আপার ও লোয়ার দু'শ্রেণীর ভাড়া যথাক্রমে চারটাকা তের আনা ও তিন টাকাসাত আনা।

দেড় মাইল পথ আসার পর বাস এসে থামলো "মৌনী-কি-রেতী" নামক জায়গায়। এই জায়গাটা পূর্বে মুনি ঋষিদের তপোবন ছিল। এখানকার ঘন বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত পরিবেশ সেইসব প্রাচীন মুনি ঋষিদের কথা আজও স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু হায়! বর্তমানে সেইসব মুনি ঋষিদের জায়গা দখল করেছে—কুলি, কাণ্ডিওয়ালা, ডাণ্ডিওয়ালা ও ঘোড়াওয়ালারা। সেই সময়কার পবিত্র নির্জন তপোবন বর্তমানে কুলি ও যাত্রীদের কলকোলাহলে মুখরিত।

সব বাসকেই এখানে এসে থামতে হয়। লোহার ফটক দিয়ে পথ বন্ধ থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না যাত্রী গোনা ও ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার কাজ শেষ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রাণীরও লোহার ফটক পার হবার হুকুম নেই। ইন্‌জেক্‌সন না নিয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখানকার ডাক্তার আমাদের দু'জনকে এ্যান্টি কলেরা ইন্‌জেক্‌সন করে একটা শ্লিপ লিখে দিলেন। আমরা যে ইন্‌জেক্‌সন নিয়েছি শ্লিপটা তারই পরিচয় পত্র। শ্লিপটা হারালে পথে আবার ইন্‌জেক্‌সন নিতে হবে। তাই খুব যত্ন করে শ্লিপটা সঙ্গে রাখলাম।

অনেক যাত্রী আবার এখান থেকে লছমন ঝোলার পুল পার হয়ে লছমনজী দর্শন করতে যান। যারা হাঁটা পথের যাত্রী তারা লছমনজী দর্শন করে ওখান থেকেই হাঁটা স্থরু করে দেয়। আর যারা বাসের যাত্রী তাদের আবার এই মৌনী-কি-রেতীতে ফিরে আসতে হয়। লছমনজীর নামানুসারে এখানকার ঝোলা অর্থাৎ পুলের নামকরণ হয়েছে লছমন ঝোলা। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই ঝোলা দড়ির ছিল তখন যাত্রীদের পারাপার হতে ত্রাসের সঞ্চার হতো। বর্তমানে আর সেই ত্রাসের সঞ্চার হয় না। এখন দড়ির তৈরী ঝোলার বদলে লোহার তারের বেশ শক্ত ও মজবুত দোদুল্যমান পুল হয়েছে। নিজ মায়ের

আদেশে দানবীর সুরযমল এই নব নি।মত পুলের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। লছমনজীর সম্বন্ধে এখানে এক প্রবাদ শোনা যায় যে,—লক্ষণ মেঘনাদ বধের পাপ প্রক্ষালনের জন্যে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে এসে একশ বছর কঠিন তপস্যা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই এখানে লছমনজীর পূজা প্রচলিত হয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যাত্রী ও পর্যটকদের মনে আনন্দ সঞ্চার করে। লছমন ঝোলার অপর পারে বাম দিকে কেদার-বদরির হাঁটা পথ পাহাড়ের ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে সর্পিল গতিতে এগিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ দিকে নীলকণ্ঠ পর্বতের পাদমূলে স্বর্গাশ্রম। এখানেও কালীকম্বলীর ধর্মশালা আছে। তা ছাড়া সাধু-সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্যে অনেক-গুলো আশ্রম বা কুঠিয়া আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার এক এক করে গাড়ী স্টার্ট দিয়ে মৌনী-কি-রেতী থেকে ছুটে চললো দেবপ্রয়াগের দিকে। ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ বাসগুলো এক এক করে এসে এক পাহাড়ের গায়ে থেমে দাঁড়ালো। অনুসন্ধান করে জানলাম, উপর থেকে বাস এলে তবে নীচের বাসগুলো ছাড়বে। কারণ এখানকার পথ সর্বত্রই 'ওয়ান ওয়ে।' অর্থাৎ এক পথেই যাওয়া আসা করতে হয়। পথ খুবই সঙ্কীর্ণ সেই কারণে পাশা-পাশি বাস চলাচল করতে পারে না, তাই মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছুটা চওড়া জায়গায় বাস দাঁড় করিয়ে উপর থেকে যে বাস আসছে তাকে 'পাস' করানো হয়; নয়তো নীচে থেকে যে বাস উপরের দিকে যাচ্ছে তাকে 'পাস' করানো হয়। একটু পরেই উপর থেকে এক এক করে বাস এসে পড়লো। দু'দিকের যাত্রীদলের মিলন ঘটলো। একদল দেবতা দর্শন শেষ করে দেবার্ঘ্য নিয়ে আনন্দিত মনে প্রত্যাবর্তন করছে—অপর দল উদ্‌গ্রীব হয়ে চলেছে দেবতা দর্শনে। সামান্যক্ষণ। তবু তারই মধ্যে কিছু আলাপ করার চেষ্টা করলাম গৃহমুখী যাত্রীদের সঙ্গে। আলাপও হল। বাস ছেড়ে দিল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। সাপের মত আঁকাবাঁকা পথ ধরে বাসগুলো ছুটতে লাগলো উপরের দিকে।

পথের এক দিকে অত্যুচ্চ পর্বত, অপর দিকে গভীর খদ—সেইখান দিয়ে কলনাদিনী ভাগীরথী স্বর্গরাজ্য ছেড়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্যে, পাপী-তাপীদের মুক্তির জন্যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে মর্ত্যের দিকে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ঘুরে ঘুরে বেলা এগারোটার সময় বাসগুলো এক এক করে এসে হাজির হলো দেবপ্রয়াগে। দূর থেকেই ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম দেখা গেল। এর আগে দুই নদীর মিলন কোন দিন দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম দুই খরস্রোতা নদীর আবেগ ভরা মিলন। মন আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল। দুই নদীর মিলনেই সৃষ্টি হয় প্রয়াগ। উত্তরাখণ্ডের অনেক স্থানে এইরূপ দুই নদীর মিলনে অনেকগুলো প্রয়াগ সৃষ্টি করেছে—তন্মধ্যে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ, এই পঞ্চ প্রয়াগই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত প্রয়াগগুলোর মধ্যে উত্তরাখণ্ডযাত্রা পথে দেবপ্রয়াগই সর্বপ্রথম প্রয়াগ। প্রতিটি হিন্দুর কাছে প্রয়াগ অতি পবিত্র স্থান। তীর্থ বিশেষ। ভাগীরথীর পুল পার হয়ে বাস যাত্রীদের দেবপ্রয়াগ শহরে প্রবেশ করতে হয়। আর হাঁটা পথের যাত্রীরা অলকানন্দার পুল পার হয়ে দেবপ্রয়াগ শহরে প্রবেশ করে।

আমরা বাসের যাত্রী, তাই ভাগীরথীর পুল পার হয়ে বদরিনাথের পাণ্ডা শ্রীধীরেন্দ্রনাথের বাসায় এসে উঠলাম। বদরিনাথের অধিকাংশ পাণ্ডার বাস এই দেবপ্রয়াগে। পাহাড়ের গায়ে বাড়ীগুলো দূর থেকে খুব চমৎকার দেখায়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম, দেখে মনে হয় সত্যি সত্যিই দেবপ্রয়াগ যেন দেবতাদের আবাসভূমি।

দেবপ্রয়াগ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শোনা যায় যে, সত্যযুগে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই স্থানে নারায়ণের কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত ছিলেন। নারায়ণ তাঁর একনিষ্ঠ তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে

দেখা দেন এবং বর প্রদান করে বলেন, এই স্থান তোমার নামানুসারে পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিগণিত হবে এবং যে ব্যক্তি এই পবিত্র ভূমির পূতনদীর সঙ্গমে স্নান করবে, তার সমস্ত পাপ বিদূরিত হবে।

আমাদের জন্মার্জিত পাপরাশি ধুয়ে-মুছে সাফ্ করার আশায় একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নানের জন্যে সঙ্গমের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গমে স্নান করার জন্যে বিরাট বাঁধান চত্বর আছে এবং স্নানার্থীদের সুবিধের জন্যে ঘাটে লোহার শিকল বাঁধা। যাত্রীরা ঐ শিকল ধরে অতি সাবধানে সঙ্গমে স্নান করে, কারণ দু'দিক থেকে আগত দুই নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পা রাখা খুবই কঠিন তার উপর স্নান করা আরো কঠিন। এখানকার ভাগীরথীর প্রবাহ স্থানকে বশিষ্ঠকুণ্ড এবং অলকানন্দার প্রবাহ স্থানকে ব্রহ্মকুণ্ড বলে। শাস্ত্রমতে, বশিষ্ঠকুণ্ডের জলে স্নান করা পুণ্যদায়ক। তীর্থযাত্রীরা এখানে নিজ নিজ পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম করে থাকে। গয়াধামের থেকেও এখানকার মাহাত্ম্য কোন অংশে কম নয়। গয়াধামে বিষ্ণুর পাদপদ্ম, আর এখানে বিষ্ণুর নাভিমণ্ডল বর্তমান।

সঙ্গমে স্নান শেষ করে বাসায় ফিরে এসে দেখি পাণ্ডার ছড়িদার আমাদের খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আহার করে একটু বিশ্রামের পর আমরা দু'জনে দেবপ্রয়াগ শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠতে হয়। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রজী ও অন্যান্য অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে। এখানকার বাজার কলকাতার মত জাঁক-জমকপূর্ণ না হলেও নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া যায়। তাছাড়া এই ছোট পার্বত্য শহরে হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, বিদ্যালয়, থানা, ধর্মশালা, ডাক ও তারঘর ইত্যাদি সব রকমের সুবন্দোবস্ত আছে। এখান থেকে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী যাওয়া যায়। তবে যে সব যাত্রী যমুনোত্রী ও

গঙ্গোত্রী যেতে ইচ্ছুক তাদের পক্ষে সরাসরি হৃষীকেশ থেকে ধরাসু পর্যন্ত বাসে যাওয়াই ভাল।

ঘুরতে ঘুরতে এসে বসলাম সঙ্গমের স্নানের ঘাটে। আঁধার রাতের কালো পর্দা ধীরে ধীরে ধরণীর বুকে নামতে সুরু করেছে। মুহূর্তে চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। দিবালোকে যা স্পষ্ট ছিল, রাতের আঁধারে তা অস্পষ্ট মনে হতে লাগলো। মুখর শহর নীরব হয়ে এলো; নির্জন ঘাট নির্জনতর হয়ে উঠলো। নীরবতা আর নির্জনতা ভেঙে দু'দিক থেকে দুই নদী একত্রে মিলিত হয়ে কল্ কল্ ছল্ ছল্ শব্দগীতি তুলে উন্মাদিনীর মত ছুটে চলেছে সাগরের আহ্বানে।

রেডিয়াম দেওয়া হাত ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখি রাত ন'টা! আর নয়—উঠে পড়লাম। বাসায় ফিরে খাওয়ার পর্ব শেষ করে শোয়ার আয়োজন করছি, এমন সময় পাশের ঘরের তিনজন বর্ষীয়সী মহিলা এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন—

তোমরা কতদিন দেবপ্রয়াগে থাকছো বাবা?

কাল সকালেই চলে যাব।

সকলে মিলে বলে উঠলেন, কালই চলে যাবে?

আমি ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, কালই।

তাঁদের মধ্যে থেকে শুভ্রকেশা এক মহিলা বলে উঠলেন, সে কি বাবা? তীর্থ স্থানে এসে তেরাত তীর্থবাস করতে হয় যে! তা না হলে কি আর পুণ্যি হয়?

শাস্ত্রে, প্রত্যেক প্রয়াগে, তীর্থস্থানে তিন রাত্রি বাস করার নির্দেশ আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমরা শাস্ত্রমতানুযায়ী তীর্থ পর্যটনে আসিনি, এসেছি নিছক বেড়াতে। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে স্থানমাহাত্ম্যে যদি কিছু পুণ্যি হয় তো ঐ এক রাত কাটালেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। একস্থানে অযথা তিনরাত্রি কাটানোর কোন মানেই হয় না। অবশ্য স্থান বিশেষে তিন রাত্রি কেন, একশ রাত্রি কাটাতেও রাজী আছি।

দেবপ্রয়াগ সত্যি সত্যি বেশ কয়েকদিন থাকার মত জায়গা। কিন্তু আমাদের সময়ের স্বল্পতার জন্যে দেবপ্রয়াগে তিনরাত্রি থাকা সম্ভব হবে না। রাত অধিক হওয়ার জন্যে ভদ্রমহিলাদের শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় দিলাম। নিদ্রাদেবী এতক্ষণ আমাদের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখে ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিলেন।

পরদিন সূর্যদেব উঠার আগেই উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে পিঠঝুলি কাঁধে তুলে বেরিয়ে পড়ি বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। শুনলাম, বাস ছাড়বে ছ'টা চল্লিশে। সকাল বেলায় পেট একেবারে খালি, বাসস্ট্যাণ্ডের ঠিক নীচেই একটা চায়ের দোকানে ঢুকে কিছু খাবার খেয়ে নিলাম। কি জানি আজ কত বেলায় আবার ভাগ্যে খাওয়া জুটবে, কি একেবারেই জুটবে না? ছ'টার সময় বাসের টিকিট ঘর খুলতেই কীর্তিনগর পর্যন্ত দুটো টিকিট কেটে নিলাম। দেবপ্রয়াগ থেকে কীর্তিনগরের দূরত্ব সাতাশ মাইল। ঠিক সময় মত বাস ছেড়ে দিলো।

ভাগীরথীর তীর ধরে ঘুরে ঘুরে বাস চলেছে এগিয়ে। কিছুক্ষণ চলার পর, ভাগীরথীর পুল পার হয়ে বাস আরো চড়াই পথে উঠতে লাগলো। এইবার বাস চললো অলকানন্দার তীর ধরে। বাস যখন কীর্তিনগরে এসে পৌঁছলো ঘড়িতে তখন ন'টা বেজে পঞ্চাশ। কীর্তিনগরই হৃষীকেশ থেকে আগত বাসের শেষ গন্তব্য স্থান। বাস থেকে নেমে অলকানন্দার পুল পার হয়ে শ্রীনগরে যেতে হয়। বাসস্টপেজ থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব তিন মাইল। গত বছরেও এই তিন মাইল পথ যাত্রীদের হেঁটেই যেতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই তিন মাইল পথের জন্যেও বাস সার্ভিস হয়েছে। মনে মনে ঠিক করে আছি তাড়াতাড়ি শ্রীনগর পৌঁছতে পারলে আজই রুদ্রপ্রয়াগ যাত্রা করবো। কেদারনাথের পথে শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে আর ওদিকে বদরিনাথের পথে পিপুলকুঠি পর্যন্ত বাসের

গতিবিধি। বাসের আশায় অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে দুপুরের দিকে হাঁটা সুরু করে দিলাম। এই তিন মাইল পথ বেশ সমতল, যাত্রীদের হাঁটতে কোন কষ্ট হয় না। বেলা তিনটের সময় আমরা শ্রীনগর শহরে পৌঁছেই ছুটলাম টিকিটের চেষ্টায়। আজ মাত্র একখানা বাস শ্রীনগর থেকে ছাড়বে। তার টিকিট অনেক আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

পঞ্চা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এখন উপায় ?

উপায় আর কি ? শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখা যাক। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।'

বৃথা সময় নষ্ট না করে বাসের কর্মকর্তাকে খুঁজে বার করে বিনয়ের সঙ্গে সব কথা বললাম। ভদ্রলোক আমাদের জন্যে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত দুটো টিকিটের বন্দোবস্ত করে দিলেন। কর্মকর্তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের পিঠঝুলি দুটো বাসের মাথায় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। বাস ছাড়তে কিছু দেরী আছে। বাসস্ট্যাণ্ডের পাশেই একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান করছি এমন সময় আমাদেরই সমবয়সী এক তরুণ যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো। নবপরিচিত যুবকটির নাম হলো শ্রীবিমলেন্দু বসু। সেও আজ চলেছে রুদ্রপ্রয়াগে। সে আমাদের সঙ্গী হতে চায়—সানন্দে গ্রহণ করলাম তাকে।

এই শ্রীনগর কিন্তু কাশ্মীরী শ্রীনগর নয়। এটা হলো ভারতের দ্বিতীয় গাড়োয়ালী শ্রীনগর। তাছাড়া এই শ্রীনগর উত্তরাখণ্ডের একটি অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান ও গাড়োয়াল রাজ্যের পুরাতন রাজধানী। সত্যযুগে সতাকন্দ রাজা, কোলাসুর দৈত্যের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে অলকানন্দার মধ্যে শ্রীযন্ত্র স্থাপনা করে মহামায়া দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। দেবী রাজার আরাধনায় প্রসন্না হয়ে রাজাকে বর দেন। দেবীর বরে বলীয়ান হয়ে রাজা দৈত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। শোনা যায়, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য সতাকন্দ রাজা কর্তৃক স্থাপিত শ্রীযন্ত্রের উপর এই নগর স্থাপনা করেন। এই শ্রীযন্ত্রের আকর্ষণে প্রতিদিন কোন না কোন যাত্রী শ্রীযন্ত্রের নিকটবর্তী তীরে এসেই প্রাণ হারাতো।

ভগবান শঙ্করাচার্য মন্ত্রবলে এই প্রাণঘাতী যন্ত্রটিকে উল্টে দেন। তদবধি অলকানন্দা নদীগর্ভে শ্রীযন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। এখন জীবিত যাত্রীর বদলে মানুষের মৃতদেহ এই তীরে আসে। অলকানন্দার এই তীরেই শ্রীনগরের মহাশশ্মান। এখানকার আদিবাসীদের মুখে শোনা যায় যে, ঐ শ্রীযন্ত্রের নামানুসারে শ্রীনগর নামের উৎপত্তি। অলকানন্দা এই স্থানে ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে। সেই কারণে এই স্থানটিকে অনেকে ধনুষতীর্থও বলে থাকে।

কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির শ্রীনগরের প্রধান দ্রষ্টব্য। এইস্থানে ভগবান বিষ্ণু, শিবকে তুষ্ট করার জন্যে সহস্র কমল দিয়ে পূজা করে মহাদেবের নিকট থেকে সুদর্শন চক্র লাভ করেছিলেন। সহস্র কমল দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন বলে মহাদেব এখানে কমলেশ্বর শিব নামে বিরাজিত। কমলেশ্বর শিবের মন্দিরটি খুব প্রাচীন। বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে এইস্থানে এক বিরাট মেলা হয়। বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী রাত্রিতে এদেশীয় বন্ধ্যারমণীরা সন্তান কামনা করে ঘিয়ের প্রদীপ হাতে কমলেশ্বর শিবের মন্দিরের চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে বন্ধ্যা রমণী সমস্ত রাত্রি ঐ ঘিয়ের অনির্বাণ প্রদীপ হাতে নিয়ে মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, তারই কামনা সফল হবে। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে বিশ্বাস থাকলে সবই সম্ভব। কয়েক বছর পূর্বে এখানে কাছারী আদি সবই ছিল ; কিন্তু যেদিন থেকে গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর থেকে পৌড়িতে স্থানান্তরিত হয় সেদিন থেকেই শ্রীনগরের শ্রী ক্রমশঃ হীন হয়ে পড়তে সুরু ক'রে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। দূরে মেঘমুক্ত আকাশের গা'য় চৌখাম্বা পাহাড় দেখা যায়।

স্কুল, ধর্মশালা, সদাব্রত, হোটেল, বাজার, ডাক ও তারঘর পরিবেষ্টিত শ্রীনগর একটি ছোট পার্বত্য শহর। এখানে লোকের বেশ ঘন বসতি আছে। শ্রীনগর মোটর বাসের সংযোগস্থল। এখান থেকে বাস রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে পিপুলকুঠি পর্যন্ত এবং ফেরার পথে পিপুলকুঠি,

রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রাজধানী পৌড়ী হয়ে কোটদ্বার রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করে। শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগের দূরত্ব আঠারো মাইল। এই আঠারো মাইল পথ বাসের ভাড়া যথাক্রমে দু'টাকা সাত আনা ও এক টাকা আট আনা। বৈকালের দিকে বাস ধর্মপ্রাণ যাত্রীদের নিয়ে শ্রীনগরকে পিছনে ফেলে ছুটে চললো রুদ্রপ্রয়াগের দিকে। পাহাড়ী পথ ঘুরে ঘুরে চড়াই আর উৎরাই করতে করতে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আমাদের নিয়ে পৌঁছে গেল রুদ্রপ্রয়াগে।

অলকানন্দার পুল পার হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ শহরে প্রবেশ করতে হয়। এই পার্বত্য শহরটি মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলের উপর অবস্থিত। রুদ্রপ্রয়াগ যে কেবল দুই খরস্রোতা নদীর মিলনকেন্দ্র তা নয়, কেদারনাথ ও বদরিনাথের দু'টি পৃথক পথেরও মিলন সংঘটিত হয়েছে এখানে। সুতরাং এ অঞ্চলে অন্যান্য প্রয়াগ অপেক্ষা রুদ্রপ্রয়াগের গুরুত্ব একটু বেশী। শহরে পদার্পণ করার পর যাত্রীদের প্রথম লক্ষ্য হলো ধর্মশালা —আগে চাই আশ্রয়। ধর্মশালায় জায়গা পাওয়া না গেলে বাধ্য হয়ে যাত্রীদের এসে উঠতে হয় চটিতে। যাত্রীদের মনের ইচ্ছা চটিতে থাকতে না হলেই, তারা যেন সুখী। কারণ চটিতে থাকার অসুবিধে অনেক। বিশেষ করে রাত্রিবাস আরো কষ্টকর, তাই সব যাত্রী এসে ভিড় জমায় ধর্মশালায়। ধর্মশালায় জায়গা খালি না থাকলে নতুন যাত্রীদের বেশ একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। আমরাও নতুন যাত্রী। বাস থেকে নেমে সোজা এসে হাজির হয়েছি কালীকম্বলীওয়ালীর ধর্মশালায়। আমাদের মত অনেক যাত্রী এসেছে, সকলেই আশ্রয়-প্রার্থী। কিন্তু জায়গা কৈ ? ধর্মশালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটুও জায়গা আর খালি পড়ে নেই। যাত্রীরা যেখানে ফাঁক পেয়েছে সেখানেই মাথা গুঁজেছে। ধর্মশালার অবস্থা দেখে নতুন যাত্রীরা আবার এক এক করে ফিরে গেল অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধানে। যাক, আমাদের

আর ফিরতে হলো না। ম্যানেজারের কৃপাদৃষ্টি পড়লো আমাদের উপর। তিনি রাতটুকুর মত আমাদের তিনজনের থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সন্ধ্যা হ'তে বেশ কিছুটা সময় বাকী আছে। দিনের আলো থাকতে-থাকতে শহরটা দেখে নেওয়া ভাল ; পরে হয়তো আর দেখাই হবে না।

জিনিসপত্রগুলো নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে ধর্মশালা থেকে নেমে আসছি, এমন সময় পিছন থেকে ডাক পড়লো—ওহে ছোক্‌রারা শুনছ ?

পিছন ফিরে দেখি এক প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক।

আমাদের ডাকছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—তোমাদেরই ডাকছি।

কিন্তু কেন বলুন তো ?

বিদেশে এই বুঝি প্রথম পদার্পণ ?

আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না তো এই বেওয়ারিশ জায়গায় জিনিসপত্র রেখে, দিব্যি সকলে মিলে হাওয়া খেতে চলেছো যে ? ওগুলোর বুঝি আর দরকার নেই ?

ভদ্রলোক আরো একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, যাও ক্ষতি নেই। ঘুরে এসে জিনিসগুলো আর পাবে না, এই যা।

না—না আমাদের জিনিস আমরা ছাড়া আর কে হাত দেবে বলুন ? আমরা সকলেই তো যাত্রী। একই পথের পথিক। তীর্থে অপরের জিনিস চুরি করা মহাপাপ। এ বোধ সব তীর্থযাত্রীর আছে। মানুষ তীর্থ করে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে, পাপ প্রক্ষালনের জন্যে। পাপ করার জন্যে নয়।

ভদ্রলোকের গৃহিনী পাশেই ছিলেন। তিনিও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের কথায় বাধা পেয়ে থেমে গেলেন। ভদ্রলোক তখন আমাদের উদ্দেশ্যে করে স্ত্রীকে বলতে লাগলেন—গিন্নী, এতকাল শুনেছ যে ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়, এবার চাক্ষুষ দেখ—এই এরাই সেই ল্যাংটা। যাদের বাটপাড়েরও ভয় নেই।

স্ত্রীকে বলা শেষ করে আমাদের দিকে প্রশস্ত চোখ দুটো মেলে ভদ্রলোক বললেন, ওহে, আধুনিক ল্যাংটারা! দিনকাল পাল্টেছে। ভারতবর্ষ আর সে ভারতবর্ষ নেই। তীর্থে পবিত্রতা থাকলেও শান্তি নেই। ধর্মপ্রাণ সরল তীর্থযাত্রীদের সাথে তীর্থস্থানগুলো অসাধু ব্যক্তিতে ভরে গিয়েছে। বাপঠাকুরদার মুখে শুনেছি যে আগে এ-পথে কেবল প্রাণান্ত কষ্ট করে তীর্থযাত্রীরাই আসা যাওয়া করতো। বর্তমানে পথ-ঘাটের সুবন্দোবস্ত হওয়ায় অসাধুরাও দল বেঁধে ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের পিছন নেয়। তাই বলি, অতো বেপরোয়া হওয়া ঠিক নয়। তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাস তোমাদের কাছেই থাক। সেটা অপরের থেকে আশা করো না। জিনিসগুলো কারুর জিম্মায় রেখে যাওয়াই ভাল।

আপনি যা বলেছেন স্বীকার করি। কিন্তু কার জিম্মায় জিনিসগুলো রাখব বলুন? এখানকার কারুকেই তো চিনি না, জানিনা। আর আমরা তো এখুনি ফিরে আসছি।

না হে না। অমন ভাবে জিনিসগুলো ফেলে রেখে যাওয়া ভাল নয়।

কি আর করব বলুন? হাঁ, আর এক হতে পারে যদি দয়া করে আপনি জিনিসগুলোর উপর একটু নজর রাখেন……….।

ইস্—বাবুরা যাবেন হাওয়া খেতে, আর ওনাদের জিনিসের ওপর নজর রাখতে হবে আমায়!

জোর করছিনা আপনাকে।

তোমরা তো বলেই খালাস। তোমাদের জিনিসের ওপর নজর রাখতে গিয়ে, এদিকে আমার জিনিস—মানে স্ত্রীর ওপর যদি কোন লোকের কু-নজর পড়ে। তখন কি হবে আমার শুনি?

বৃদ্ধ হলে মানুষ রসিক হয় সবচেয়ে বেশী। এই ভদ্রলোকটিই তার সাক্ষ্য। ইনি বয়সে প্রবীণ হলে কি হবে, রসিক খুব। ভদ্র-লোকের রসিকতা শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম। আমাদের হাসতে দেখে ভদ্রলোকের স্ত্রী একটু লজ্জায় পড়লেন। স্বামীর প্রসঙ্গটা

চাপা দেওয়ার জন্যে ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, যাও বাবা, তোমরা ঘুরে এসো। আমরা তোমাদের জিনিস দেখব'খন।

নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ি শহর ভ্রমণে। পথের দু'ধারে জনতার ভিড়। ভিড়ের কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীমুন্সীজী রুদ্রপ্রয়াগ দর্শনে আসছেন। রুদ্রপ্রয়াগে রাত্রিবাস করে পরের দিন আবার বদরিনারায়ণের পথে যাত্রা করবেন। শ্রীমুন্সীজীকে দেখব বলে ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ি। অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমুন্সীজী সদলবলে ডুলি করে ধর্মশালার কাছ বরাবর এগিয়ে এলেন। অপেক্ষারত যাত্রীর দল সকলেই করপুটে শ্রীমুন্সীজীকে নমস্কার করল। তিনিও সকলকে নমস্কার করতে করতে এগিয়ে চললেন গন্তব্যস্থানের দিকে। আমরা দু'জনে কেবল তাঁকে স্কাউট প্রথায় অভিবাদন করে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে এগিয়ে চলি, রুদ্রনাথ ও মন্দাকিনী-অলকানন্দার সঙ্গম দর্শনে। মাননীয় শ্রীমুন্সীজীকে প্রথম দেখি কলকাতায়। তাও দূর থেকে। বক্তৃতামঞ্চে। কাছে গিয়ে আলাপ করার সুযোগ ঘটেনি সেদিন। কিন্তু আজ তাঁকেই দেখছি, দূর থেকে নয়, অতি নিকটে। রাজনৈতিক বক্তা হিসাবে কোন মঞ্চের উপরে নয়, একেবারে আমাদেরই মত যাত্রিকের বেশে—পথের উপর। তীর্থের মাহাত্ম্য এমনি যে, এ পথে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র সকলেই সমান। সবাই যাত্রিক। যাত্রীরা পথে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সাময়িকভাবে পরিচিত হয়ে উঠে! পথের রীতিই এই।

শ্রীমুন্সীজী চলেছেন, আমরা এবং আরো অনেক যাত্রীও চলেছি তাঁর পাশাপাশি। চলতে চলতে শ্রীমুন্সীজী আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথাকার স্কাউট ?

কলকাতার।

কলকাতা থেকে আসছি শুনে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন এবং যথেষ্ট প্রশংসাও করলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, হিয়ার ইউ উইল্ গেট্ মোর অ্যাডভেঞ্চার্স্।

অফ্‌কোর্স্‌, উত্তরটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো—যেন তৈরীই ছিল।

উত্তরাখণ্ডের প্রধান পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগ হলো দ্বিতীয় প্রয়াগ। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এই পবিত্র প্রয়াগ। রুদ্রনাথ এখানকার প্রধান দেবতা। তাই বোধ হয় দেবতার নামের পরে প্রয়াগ সংযুক্ত করে এই তীর্থের নাম রাখা হয়েছে রুদ্র-প্রয়াগ। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম দেখতে যেতে হলে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামতে হয়। উপর থেকে দেখলে মনে হয় সিঁড়িগুলো যেন পাতাল রাজ্যে নেমে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে কিছু ধাপ নামার পর বাম হাতেই দেবী মন্দির। অতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামতে বেশ কষ্ট লাগে। স্নানার্থীদের সুবিধের জন্যে দেবপ্রয়াগের মত এখানকার স্নানঘাটেও শিকল বাঁধা আছে। যাত্রীরা ঐ লোহার শিকল ধরে খুব সাবধানে সঙ্গমে স্নান করে। শাস্ত্রে প্রত্যেক প্রয়াগেই স্নানের বিধি আছে। জন্মজন্মার্জিত সুকৃতির ফলে মনুষ্যভাগ্যে প্রয়াগস্নান ঘটে থাকে। রুদ্রপ্রয়াগে স্নান মাহাত্ম্য এমনি যে, এখানে একবার স্নান করলে মানুষ সদ্য পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে। অর্জুনতয়ার পুত্রগণ একবার বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। গয়ের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে দুই লক্ষ ব্রাহ্মণ সমবেত হয়েছিলেন। হঠাৎ কোন এক কারণে তাঁরা পরশুরামের কোপানলে পতিত হয়ে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হন। পরে তাঁরা মন্দাকিনী-অলকানন্দার সঙ্গমের পূতবারিতে স্নান করে মুক্তিলাভ করেন। সেই অনুকরণে ভক্ত যাত্রীরা এই সঙ্গমের পূতবারিতে স্নান করে জীবনের অর্জিত সমস্ত পাপরাজি বিসর্জন দেয়।

অত অবেলায় স্নান না করে সঙ্গমের পূতবারি মাথায় স্পর্শ করে উঠে এলাম রুদ্রনাথের মন্দিরে। মন্দিরটি সঙ্গমস্থলের ঠিক উপরেই অবস্থিত। এখানকার দেবদেবীর মধ্যে রুদ্রেশ্বর, নারদেশ্বর, গোপালেশ্বর, সোমেশ্বর ও দেবী অন্নপূর্ণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি

নারদ সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ হওয়ার জন্যে এই পবিত্রতীর্থে দেবাদিদেব রুদ্রেশ্বরের তপস্যা করেছিলেন। দেবাদিদেব রুদ্রেশ্বর, পরম ভক্ত নারদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

রুদ্রেশ্বর পাষাণ মূর্তি। তাঁর কাছেই মানুষ অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে হৃদয়ের শোক তাপ নিবেদন করছে। মানুষের কথা, কঠিন পাষাণ আবরণ ভেদ করে দেবতার কোমল হৃদয় স্পর্শ করে কিনা জানি না। জানার প্রয়োজনও নেই, এখানে চাই বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আর ভক্তি। তাই আর পাঁচজন যাত্রীর মত রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন আমার মুখ দিয়ে শুধু এই কথাই বেরিয়ে এলো—

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
অবীরাবীর্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাংপাহি নিত্যম্।"

অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা কর। দেবতার প্রতি এই হলো আমার অন্তরের প্রার্থনা। মন্দিরে ভিড়ের মধ্যে বেশীক্ষণ না থেকে বেরিয়ে পড়ি পথে।

ধর্মশালা, সদাব্রত, ডাক ও তারঘর, ডাক্তারখানা, কুলি এজেন্সী, বিদ্যালয় ও বাজার ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে এই ছোট পার্বত্য শহরটিকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে। যাত্রার কয়েক মাস এই সব পার্বত্য শহরগুলো যাত্রীদের কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে। সমুদ্র থেকে এই শহরটি ২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে লোকের বসতি আছে। মন্দাকিনীর অপর পারে রুদ্রপ্রয়াগের গ্রাম। এই গ্রামে যেতে হলে খরস্রোতা মন্দাকিনীর উপর সাবেকী দড়ির পুল পার হয়ে যেতে হয়। পূর্বে কেদার-বদরির পথে সর্বত্রই

এইরূপ দড়ির পুলের বন্দোবস্ত ছিল। বর্তমানে যাত্রীদের কোথাও আর দড়ির পুল পারাপার হতে হয় না। দড়ির পুল সত্যি সত্যি বিপদজনক। এই বিপদ সঙ্কুল ভীতিপ্রদ পুল পারাপার হওয়ার কৌতূহল আমার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। পঞ্চা ও বিমল পুলের অবস্থা দেখে মন্দাকিনীর অপর পারে যেতে রাজি হলো না। কারণ পুলটির অবস্থা তেমন সুবিধেজনক ছিল না। দড়ির পুলের গঠন কৌশলও ভিন্ন। গাছের ছাল পাকিয়ে পাতলা পাতলা চেপ্টা বাঁশের বুনুনি দিয়ে তৈরী এই পুল। পুলটির অবস্থা খুবই সঙ্গীন; কয়েক জায়গায় আবার বাঁশের ঐ চেপ্টা পাটা নেই। সেইসব জায়গা পার হওয়া আরো বিপদজনক। বাঁশের একটা পাটা থেকে অপর পাটায় পা দিতে হলে বেশ কিছুটা লাফিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া 'ন অন্যপন্থা।' অসীম সাহসী না হলে, এই জীর্ণ দোদুল্যমান দড়ির পুল পারাপার হওয়া অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা। পথ বিপদসঙ্কুল জেনেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। পথে তো বিপদ-আপদ আছেই। আর তার উপরেও রয়েছেন এমন একজন যিনি, সম্মুখে বিপদ জেনেও মৃত্যু ভয়কে অগ্রাহ্য করে বিপদের মধ্যে দিয়ে যারা পথ করে এগিয়ে যায়, সেইসব অসমসাহসীদের বিপদাপদ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন। আমিই প্রথম এই দোদুল্যমান পুল পারাপার হওয়ার মনস্থ করি। এই ধরণের পুলগুলোয় একজনের বেশী যাতায়াত করা যায় না। একসঙ্গে দু'তিনজন যাতায়াত করাও ঠিক নয়। পুলের বহনশক্তি নেই বললেই চলে। একজন করে কোন রকমে পারাপার হওয়া যায় মাত্র। অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই পুলের উপর দিয়ে চলতে সুরু করে দিই। চলার সময় পুলটির কম্পন গেল বেড়ে; তখন কেবলই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ছিঁড়ে পড়ে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ঐ দুর্ঘটনা কারুর একবার ঘটে, তা হলে আর রক্ষা নেই। একেবারে নিশ্চিহ্ন।

আমার নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে যাওয়া দেখে, সাহসে ভর করে পঞ্চা ও পরে বিমল পুলটি সাবধানে পার হয়ে এলো। এপার থেকে সঙ্গমের

দৃশ্য খুব চমৎকার দেখায়। দু'দিক থেকে প্রবাহিত দুই খরস্রোতা নদী একত্রে মিলিত হয়ে, চপলা কিশোরী বালিকার মত কল্ কল্ ছল্ ছল্ সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি তুলে ছুটে চলেছে।

"ও কিশোরী চঞ্চলা গো, কোন খেয়ালে যাও।
উচ্ছলতা ছন্দে তোমার কি গান তুমি গাও!"

মানুষের কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না নদী। শুধু কানে এসে বাজে তার কল্ কল্ ছল্ ছল্ সঙ্গীতের স্নিগ্ধ ঝংকার।

দিনের শেষে পশ্চিমাকাশের বাকী আলোর রশ্মিটুকুও ম্লান হয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে 'গুটায় সোনার পাল সুদূরে নীরবে দিনের আলোকতরী চলি যায় যবে অস্তাচলের ঘাটে' তখনই বিরাট বিশ্বের প্রাণস্পন্দনের চেতনা নিয়ে ধরার বুকে নেমে আসে সন্ধ্যা। তারপর সোনার পাল গুটিয়ে আলোক তরী যখন ওপারে অস্তাচলের ঘাটে গিয়ে পৌঁছায়, তখন অন্ধকার নামে এপারে। আকাশে ফুটে উঠে এক ঝাঁক তারা। মর্ত্যবাসীর কাছে, কবি ও যোগী-ঋষির কাছে রাত্রির চেয়ে অধিক প্রিয় হলো সন্ধ্যা। কারণ সন্ধ্যা হলো দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণ। এই সময় কর্মক্লান্ত পৃথিবী শান্ত হয়ে আসে। যোগী-ঋষিরা বসেন ধ্যানে। দেবতার মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির ঘটা পড়ে যায়। শঙ্খে শঙ্খে, শিঙায় শিঙায় মঙ্গল ঘোষণা হয় দিকে দিকে। মুহূর্তের মধ্যে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে সন্ধ্যা।

এপারে আর বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ঐ ভয়ানক পুল পার হওয়া আরো কঠিন হয়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলিত পূতবারিতে সন্ধ্যা আহ্নিকের কাজ শেষ করে পুনরায় দোদুল্যমান পুলটি সাবধানে অতিক্রম করে ফিরে আসি অস্থায়ী ডেরায়। ফেরার পথে বাজার থেকে রাত্রের আহার্য-সামগ্রী কিনে নেওয়া হলো। না এত তাড়াতাড়ি খাওয়ার পর্ব শেষ করলে চলবে না। খাওয়া শোয়ার আগে সব কাজ গুছিয়ে ঠিক করে রাখতে হবে, যাতে সকালে উঠে যাত্রার সময় কোন হট্টগোল করতে

না হয় কারণ আমরা যখন যাত্রা সুরু করব, তখন সমস্ত রুদ্রপ্রয়াগ শহরটাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকবে। ঘুমটা প্রত্যেকেরই শান্তির জিনিস। রাত্রে মানুষ যতটুকু ঘুমায়, ততটুকু সে জগতের ভাবনা চিন্তার হাত থেকে মুক্ত থাকে। তাই অযথা কারুর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো আমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

নিজেদের জিনিসপত্র সমস্ত পথ এবার নিজেদেরই বহন করে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং বোঝা যত কমিয়ে হাল্কা করা যায় ততই ভাল। বোঝা হাল্কা করার জন্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বস্তায় বেঁধে নাম, ঠিকানা লিখে বস্তাটা ধর্মশালার জিম্মায় ছেড়ে দিলাম। ফেরার পথে জিনিসগুলো আবার ঠিক মত পেলেই হলো। এখানে জিনিসপত্র জমা রাখার জন্যে কর দিতে হয়। কেবল হৃষীকেশের কালীকম্বলীর হেড্ কোয়াটার্স ছাড়া উত্তরাখণ্ডে সর্বত্রই যাত্রীদের জিনিস জমা রাখার জন্যে কর দিতে হয়। আর চটিতে উঠলে বিনা করে জিনিসপত্র চটিওয়ালার কাছে জমা রাখা যায়। কিন্তু চটিওয়ালার একটি সর্ত আছে। যদি কোন যাত্রী চটিতে এসে উঠে জিনিসপত্র জমা রেখে যতে চায়, তবে তাকে সর্তানুসারে চটিওয়ালার কাছ থেকে অন্তত দু'বেলার খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করতে হবে। নচেৎ কোন যাত্রীর ভাগ্যে চটিতে থাকা কিংবা জিনিসপত্র জমা রাখার সুযোগ ঘটবে না। এখানকার সব চটিওয়ালাদের ব্যবসাই হলো এই।

রাত্রি অধিক হয়ে চলেছে—তাই তাড়াতাড়ি সঙ্গের জিনিসপত্রগুলো পিঠঝুলিতে গুছিয়ে রেখে, কেদারনাথকে স্মরণ করে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম।

১৩ই মে। আজ থেকে আমাদের প্রকৃত হাঁটা পথে যাত্রা সুরু হবে। কারণ, রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই কেদারনাথের হাঁটা পথ আরম্ভ। সূর্যদেব ওঠার অনেক আগে উঠে যাত্রিকের পোষাক পরে রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ধর্মশালার অন্যান্য যাত্রীরা তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন রয়েছে। তাই কারুর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমরা তিনটি প্রাণী নিঃশব্দে নেমে এলাম পথে। চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পথ অচেনা অজানা। লোকমুখে শুনেছি পথ খুবই দুর্গম। বাবা কেদারনাথকে স্মরণ করে আজ সেই দুর্গম পথে যাত্রা সুরু করে দিলাম।

টর্চের বোতাম টিপে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে চলেছি ; হাতে লাঠি, পিঠে ঝুলি (হ্যাভারস্যাক), পায়ে কেডস্ জুতা, আর মনে যাত্রার অপূর্ব স্পন্দন। দূরে পাহাড়ের মাথায় শুকতারা জ্বলছে জ্বল জ্বল করে পথের নিশানা হয়ে।

"সুন্দরী তুমি শুকতারা সুদূর শৈল শিখরান্তে
শর্ব্বরী যবে হবে সারা দর্শন দিয়ো দিকভ্রান্তে।"

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী সর্পিল পথ বেয়ে পথের নির্জনতা ভঙ্গ করে চড়াই পথে এগিয়ে চলেছি কেদারনাথের দিকে। মন্দাকিনীর পাশ দিয়ে কেদারনাথ যাওয়ার পথ। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথের দূরত্ব আটচল্লিশ মাইল। পাহাড়ী পথ মাইলের পর মাইল হাঁটা অনভ্যস্ত যাত্রীদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। শুধু তাই নয়, ক্রমাগত হাঁটা শরীরের পক্ষেও কষ্টকর। বিদেশে শরীরকে অযথা কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। মাঝপথে শরীর যদি ভেঙ্গে পড়ে, উদ্দেশ্য যদি সফল না হয়, তাহলে তীর্থে এসে লাভ কি ? শরীরকে কষ্ট না দিয়ে, অসুবিধের মধ্যে দিয়ে না চলে, পাহাড়ী পথে প্রত্যেক তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের 'হাইকিং' প্রথায় পথ চলা উচিত। 'হাইকিং' প্রথায় পথ চললে, পথচলাজনিত শ্রম মনেই হয় না। দিব্যি আরামে পথ চলা যায়।

'হাইকিং'টা আমেরিকান কথা, এর অর্থ হলো 'গো ঈজি' অর্থাৎ শরীরকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে আরামে চলো।

সমতল ভূমির লোক আমরা, পাহাড়ী পথে চলা আমাদের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার। আর ক্রমাগতভাবে পাহাড়ী পথে চললে শরীরে কষ্ট তো হবেই। পথে যদি শরীর খারাপ হয়, বিশেষ করে পা দু'টো যদি অকেজো হয়ে পড়ে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকে না। তাই ক্রমাগতভাবে চড়াই উৎরাই পথে না হেঁটে 'হাইকিং' প্রথায় চলাই যুক্তিযুক্ত। 'হাইকিং' প্রথায় চলার সময় হাইকারদের সুবিধার্থে কতকগুলো নিয়ম পালন করে চলতে হয়। এলোমেলোভাবে পথ চলা ঠিক নয়। হাইক করে যেতে হলে এমন সব জিনিস সঙ্গে নিতে হবে যা নিজে বইতে পারা যায়। কেবল মনে রাখতে হবে, কি আমার না হলে চলে। অযথা অনেকগুলো জিনিস নিয়ে নিজেকে ভারাক্রান্ত করে তোলার কোন অর্থ হয় না। তাই হাইকারদের জিনিসপত্র বহন প্রণালী একটু ভিন্ন রকমের। 'র‍্যাকস্যাক্' বা অনেক পকেট বিশিষ্ট ব্যাগের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পুরে দু'কাঁধের উপর দিয়ে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। এভাবে জিনিস বহন করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো হাত দু'টোকে ফাঁকা রাখা। চলার সময় ডায়েরি বা কিছু লেখার দরকার হতে পারে। আর হাত ফাঁকা থাকলে লাঠি ধরে পাহাড়ে চড়াই-উৎরাই করতে খুব সুবিধে হয়। 'হাইকিং' মানে এই নয় যে, কোন নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছতেই হবে। আগেই বলেছি 'হাইকিং' করে চলা মানে আরাম করে চলা। 'হাইকিং' চলার প্রধান উপায় হচ্ছে, দু'মাইল হাঁটা আর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম। এইরূপভাবে দিনে আট-দশ মাইলের বেশী হাঁটা উচিত নয়। পথ চলার সময় বিশেষ করে পা ও পায়ের নখের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। পুরানো জুতা বা কেডস্ পরে চলা উচিত। তাহলে পায়ে ফোস্কা পড়ার ভয় থাকে না। 'হাইকিং' প্রথায় চললে একধারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে আর মনেও প্রচুর আনন্দ

পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, পথের দ্রষ্টব্যগুলোও ভালো করে দেখা যায়।

আমরা কেদারনাথের পথ ধরেই হেঁটে চলেছি। প্রথমে কেদারনাথ দর্শন করে তুঙ্গনাথ হয়ে বদরিনাথ যাব এই ইচ্ছা। পথে পাণ্ডাদের মুখে শোনা গেল, প্রথমে কেদারনাথ দর্শন করে পরে বদরিনাথ দর্শন করতে হয়। এই বিধি শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে। শাস্ত্রের ফলাফল বিচার না করে, সুবিধের জন্যে আমরা কেদারনাথের পথ ধরেই চলা সুরু করি।

সাড়ে চার মাইল হাঁটার পর প্রথমে পড়লো ছাতৌলী চটি। হাত-মুখ ধুয়ে সকালের প্রাতঃরাশ এই চটিতেই সেরে নিই। চারিদিক বেশ ফর্সা হয়ে গিয়েছে। পথে লোকজন চলাচল সুরু করে দিয়েছে। এখান থেকে তিন মাইল দূরে রামপুর চটি। রামপুরে ত্রিপুরেশ্বর শিবের মন্দির আছে। পথ বেশ সমতল ও চওড়া। পথ চলতে কোন কষ্ট হয় না। পথের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে কখন যে রামপুর চটি ছাড়িয়ে অগস্ত্যমুনি চটিতে এসে পৌঁছে গিয়েছি খেয়ালই নেই। ছাতৌলী থেকে অগস্ত্যমুনি চটির দূরত্ব সাড়ে সাত মাইল। স্থানটি খুবই নির্জন ও সমতল। মহামুনি অগস্ত্য এই নির্জন স্থানে বসে তপস্যা করেছিলেন। তাই তাঁর নামানুসারে এই চটির নামকরণ করা হয়েছে অগস্ত্যমুনি চটি। এখানকার আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য হলো, দু'টি প্রাচীন মন্দির। একটি মুনি অগস্ত্যের, অপরটি অগস্ত্যেশ্বর শিবের মন্দির। অগস্ত্য মন্দিরে—পুরাণ বর্ণিত বিন্ধ্যপর্বতের দর্পচূর্ণকারী ও এক গণ্ডুষে সমুদ্র শোষণকারী মুনিপ্রবর অগস্ত্যের অষ্টধাতুর প্রতিমূর্তি আছে। মহাপরাক্রমশালী মুনি অগস্ত্যকে এবং অগস্ত্যেশ্বর শিবকে ভক্তি ভরে প্রণাম করলাম। এখানে মন্দাকিনীর তীরে বিদ্যাভবন, ছাত্রদের খেলার মাঠ এবং বহুদিনের পরিত্যক্ত এরোপ্লেন অবতরণের একটি ঘাঁটি আছে। অগস্ত্যমুনি চটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার পথ ধরি। পথে যাত্রীরা চলেছে দলে দলে। চলার সময় যাত্রীদের মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে

"জয় কেদার, জয় বদরি" ধ্বনি শোনা যায়। দেবতার এই জয়ধ্বনি তীর্থযাত্রীদের মনে পথ চলার উৎসাহ আরো বাড়িয়ে দেয়। পথে দেবতার জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রীদের উৎসাহিত করে আমরাও চলার নেশায় চলেছি এগিয়ে। 'নৌকা মোদের নোঙর জানে না, শুধু চলে স্রোতে ভাসি।' চলতে চলতে যখন ক্লান্তি আসে তখনই কেবল আশ্রয় নিই ধর্মশালায় অথবা চটিতে। বিশ্রামান্তে আবার পথ চলি। বেলা বারোটায় এসে হাজির হই চন্দ্রপুরী চটিতে।

চন্দ্রপুরী বেশ বড় চটি। বিভিন্ন যাত্রীতে চন্দ্রপুরী জমজমাট হয়ে আছে। এইখানেই দিবা আহারের বন্দোবস্ত করার জন্যে পছন্দমত একটা চটি বেছে নিই। পিঠঝুলি কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রাম করে, লেগে পড়ি রান্নার কাজে। রান্না শেষ করে বেরিয়ে পড়ি স্নানের জন্যে। এখানে চন্দ্রা ও মন্দাকিনীর মিলন সংঘটিত হয়েছে। ঐ দুই নদীর সঙ্গমের উপর শিবদুর্গার মন্দির আছে। সঙ্গমে বেশী জল না থাকায় আমরা একটু দূরে এসে মন্দাকিনীর হিমশীতল জলে স্নান করে চটিতে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে আরো অনেক নতুন যাত্রীর আবির্ভাব হয়েছে। এদিকে উদর দেবতা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। আর বিলম্ব নয়, আগে উদর দেবতাকে ঠাণ্ডা করা দরকার। খাওয়াদাওয়ার শেষে চটিওয়ালার বাসনপত্র ও পাওনাগণ্ডা সব চুকিয়ে দিয়ে রওনা হব হব করছি, এমন সময় নামলো মুষলধারে বৃষ্টি। এ অবস্থায় কি করেই বা পথে বার হওয়া যায়? তাই বসে বসে ভাবছি কি করা যায়? বৃষ্টির জন্যে অলসভাবে তিনজনই বসে আছি। আমাদের চটির সামনে এসে উঠে ছিলেন এক বাঙালী পরিবার। আমরা বাঙালী জেনে তারা আমাদের সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়ে নিলেন। অল্প পরিচয়েই আমাদের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠলো। আমরা সকলেই মুসাফির। আমাদের আলাপ পরিচয় আত্মীয়তা সব কিছুই মুসাফিরখানা অর্থাৎ চটি কিংবা ধর্মশালাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। যতক্ষণ এক জায়গায় থাকি

ততক্ষণ আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় থাকে। আবার যখন পথে নামি তখন কেবল ফেলে আসা চটির স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছুই মনে থাকে না। থাকা সম্ভবও না। নিত্য নতুন আলাপ, নিত্য নতুন যাত্রীদলের সংস্পর্শে পুরাতন যাত্রীদলের আলাপ-পরিচয়, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের রজ্জু শিথিল হয়ে পড়ে। তবুও পথে, যাত্রী নিবাসে সকলের সঙ্গে আলাপ হয়।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পর ধীরে ধীরে বৃষ্টির দৌরাত্ম্য কমে এলো। বৃষ্টি থেমে যেতেই আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। বিলম্ব না করে আমরাও পথে নেমে পড়ি। পথ ফাঁকা। আমরা তিনজন ছাড়া আর কোন যাত্রী পথে নেই। আকাশে আবার অল্প অল্প মেঘ জমতে সুরু করেছে। বুঝিবা বৃষ্টির পূর্বাভাস। দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকার করে এলো। অন্ধকার গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হলো। এই বুঝি মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। পথে দাঁড়াবার মত আশ্রয় নেই। চটি কতদূর তাই বা কে জানে? টর্চের বোতাম টিপে সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দম বন্ধ করে দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগলাম। রাত সাড়ে সাতটার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছলাম ভীরী চটিতে। ইচ্ছা ছিল আরো একটু এগিয়ে যাই, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে আর এক পাও এগোতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এক বৃদ্ধ চটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—গুপ্তকাশী কতদূর?

বৃদ্ধ বললে, আরো দু'টো চটির পর গুপ্তকাশী। পথ চড়াই।

আকাশের এই অবস্থা, সামনে চড়াই। যাত্রা করব কিনা ভাবছি। বৃদ্ধ আমাদের মনের কথা টেনে নিয়ে বললো, মহারাজ, আজ আউর মাত যাইয়ে।

বৃদ্ধস্য বচনং, অগ্রাহ্য না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাতটুকু বৃদ্ধ চটিওয়ালার আশ্রয়েই রইলাম। এখানে ধর্মশালা, ও খানদু'য়েক চটি আছে। যাত্রীরা বড় একটা এখানে রাত কাটায় না। কেবল আমাদের মত দু'একটা ছন্নছাড়া যাত্রী বিপদ কাটানোর জন্যে মধ্যে

মধ্যে এসে আশ্রয় নেয়। ভীরীর দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে ভীমসেন ও বলরামের দুই প্রাচীন মন্দির উল্লেখযোগ্য।

আজ এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ার মত শরীরের অবস্থা ছিল না। চটিওয়ালাকে রান্নার কথা বলতে সে আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলো। চটিওয়ালা আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে—রাত্রিটা হয়ত নিরম্বু উপবাসেই কাটতো। কেদারনাথের কৃপায়, চটিওয়ালার মর্জিতে রাতটা আর উপবাসে কাটলো না। রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় চটিওয়ালার রান্না একটু ভাজি আর চাপাটি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহ শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। রাত্রির দুর্যোগের কোন কথাই জানি না। একেবারে এক ঘুমেই রাত কাবার।

পরের দিন যথারীতি সূর্য ওঠার আগে উঠে পিঠঝুলি কাঁধে তুলে নিয়ে টর্চের বোতাম টিপে ভীরী চটি থেকে রওনা দিলাম। পথে একটিও জনপ্রাণী নেই। পথ নিস্তব্ধ, নিঝুম। আকাশ বেশ ফর্সা না হলে পথে যাত্রী চলাচল সুরু হয় না। পথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হিমশীতল বাতাস ঠেলে আমরা চলেছি এগিয়ে। ভীরী চটির দেড় মাইল পর নারায়ণ চটি। নারায়ণ চটির পর থেকে পথ আবার চড়াইয়ে উঠে গিয়েছে। নারায়ণ চটি থেকে কিছু দূর এগিয়ে এসে দেখি পথ বন্ধ। পথের উপর পাহাড়ের বিরাট ধ্বস নেমেছে। যে মারাত্মক প্রাণঘাতী ধ্বস নামার কথা পথে লোকমুখে শুনেছিলাম. আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম। সত্যি সত্যি এই পাহাড়ের ধ্বস দৈবাৎ যদি কোন যাত্রীর ঘাড়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই। তখুনি জীবন্ত সমাধি। পথ পরিষ্কার না হলে, ঐ ধ্বস নামা বিপজ্জনক পাথরের উপর দিয়ে চলা খুবই মুস্কিল। পথ পরিষ্কারের আশায় বসে থাকলে অনেক বেলা হয়ে যাবে। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ

নেই। সাহসে ভর করে ধ্বস নামা বড় বড় পিচ্ছিল বিপদপূর্ণ পাথর টপ্‌কে টপ্‌কে কোন রকমে পথে এসে উঠলাম।

চলতে চলতে সূর্যদেব যে কোন ফাঁকতালে তড়াক করে একলাফে উঠে পড়েছে লক্ষ্য করিনি। ইচ্ছা ছিল সূর্যোদয় দেখব, কিন্তু তা আর হলো না। প্রভাতী সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠলো। দূরে স্পষ্ট দেখা গেল রজতশুভ্র গিরিরাজ হিমালয়কে। হিমালয়ের চুড়া থেকে বরফ গলা জল পড়ছে অনবরত। হিমালয়ের এই অপূর্ব, অতুলনীয় দৃশ্য দেখে গর্বভরে বলতে ইচ্ছা করে, কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান? শোভা-সৌন্দর্যের আকর হিমালয়। এর অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যের কথা, বলে কিংবা লিখে শেষ করা যায় না। হিমালয়ের শোভা-সৌন্দর্য হলো নিত্য-নতুন, অনাদি, অনন্ত, বর্ণনার অতীত।

"হে ভগবান!
অসিত গিরিসমাং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রং
সুরতরুবর শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখিত যদি গৃহিত্বা সারদা সর্বকালং
তদাপি তব গুণানামশী! পারং ন যাতি।"

এই বিশাল কৃষ্ণ পর্বত যদি কজ্জল হয়, সপ্ত-সমুদ্র যদি মসীর আধার হয়, সুবিস্তৃতা বসুমতী যদি পাত্ররূপে পরিণত হয়, কল্পদ্রুমের প্রধান শাখা যদি লেখনী হয়, আর স্বয়ং দেবী সরস্বতী যদি অনন্তকাল-ব্যাপী লেখেন, তা'হলেও তিনি, হে ভগবান, তোমার সৌন্দর্যের কণামাত্র ব্যক্ত করতে সমর্থ হবেন না।

চারিদিকের নৈসর্গিক শোভা দেখতে দেখতে সকাল সাড়ে ছ'টার সময় এসে হাজির হলাম গুপ্তকাশীতে। গুপ্তকাশী উত্তরাখণ্ডের আর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এ-পথে তীর্থের অভাব নেই। শোনা যায়, উত্তরাখণ্ডে নাকি সওয়া লক্ষ পর্বত ও আশী লক্ষ তীর্থ আছে। একত্রে এত তীর্থের সমাবেশ বড় সহজ কথা নয়।

গুপ্তকাশীতে যাত্রী প্রবেশ করলেই প্রথমে পাণ্ডা ধরবে যাত্রীকে। শোনাবে গুপ্তকাশীর মাহাত্ম্য আর তার ইতিবৃত্ত। সে কাহিনী পাণ্ডার কণ্ঠে শুনতে শুনতে যাত্রীর মনে লাগে এক চমক। পাণ্ডা বলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জ্ঞাতি হত্যা করার পর জ্ঞাতি হত্যাজনিত পাপ প্রক্ষালনের জন্যে পঞ্চপাণ্ডব বিশ্বনাথের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে কাশীতে হাজির হন। বিশ্বনাথ টের পেয়ে কাশী থেকে সরে পড়েন হিমালয়ের পথে। তারপর পাণ্ডবরাও হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন। শিবকে দর্শন করে পাপপ্রক্ষালন করা চাই; নয়তো পাপপূর্ণ দেহ নিয়ে তো আর মহাপ্রস্থান করা চলে না। তাই তাঁরা পাঁচ ভাই মিলে হাজির হলেন এই স্থানে। বিশ্বনাথ পঞ্চপাণ্ডবদের আগমন বার্তা জানতে পেরে এই স্থানে গোপনে লুকিয়ে পড়েন। যাতে পাণ্ডবরা তাঁর দর্শন না পান। বিশ্বনাথের গোপনে লুকিয়ে পড়ার পর থেকেই এই স্থানটি গুপ্তকাশী নামে প্রচলিত হয়। গুপ্তকাশী, ভারতের পঞ্চকাশীর অন্যতম এক কাশী। তারপর হাত ধরে পাণ্ডা ঠাকুর সোজা যাত্রীকে নিয়ে যায় মন্দিরে। এই স্থানের মন্দিরের প্রধান দেবতা হলেন বিশ্বনাথ। তাছাড়া এই মন্দিরের মধ্যে অন্যত্র অর্ধনারীশ্বর ও পঞ্চপাণ্ডবদের মন্দির আছে। বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্মুখে মণিকর্ণিকা কুণ্ড নামে চারকোনা একটি শীতল জলের কুণ্ড আছে। পিতলের গোমুখ দিয়ে গঙ্গা ও পিতলের গজ মুখ দিয়ে যমুনার জলধারা এই কুণ্ডে এসে পড়ছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে গোমুখীর ধারায় স্নান করে ষোড়শ উপচারে বিশ্বনাথের পূজা করা বিধি। এখানে, কুমারী, সধবা পূজা, গোদান, ভূর্জিদান, গুপ্তদান ইত্যাদির প্রথা আছে। গুপ্তদান অর্থাৎ ধর্মার্থী যাত্রীরা বাজার থেকে শুকনো নারকেল কিনে তার মধ্যে করে নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী সোনা, রূপো, টাকা প্রভৃতি পাণ্ডার হাতে তুলে দেয়। সেটি পাণ্ডারই প্রাপ্য।

মণিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান করে পূজার বিবিধ উপচার সাজিয়ে যাত্রীরা দলে দলে ঢুকছে বিশ্বনাথের মন্দিরে। আমরাও যাত্রী দলের পিছু পিছু এসে ঢুকলাম মন্দিরে। পূজা শেষ করে যাত্রীরা আবার একে একে

মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো। সকলের তো পূজা হয়ে গেল, কিন্তু দেবতাকে আমরা কি দিয়ে পূজা করবো? সঙ্গে তো আনা হয়নি দেবপূজার কোন উপচার! সঙ্গে আছে শুধু হৃদয়ের ক্ষুদ্র সম্বল ভক্তি-অর্ঘ্য। তাই নিবেদন করলাম জগৎ পিতা ও জগন্মাতার শ্রীচরণে। মন্দির থেকে ফেরার পথে ভক্তিপূর্ণচিত্তে মাথায় তুলে নিলাম মন্দিরের পবিত্র রেণু।

গুপ্তকাশীর অপর পারে হলো উখীমঠ। মঠটি কেদারনাথ থেকে ফিরে নালাচটি হয়ে চামোলী যাওয়ার পথে পড়ে। গুপ্তকাশী থেকে রওনা হবার সময় বিদ্যাপিঠের দু'জন কিশোর ছাত্র আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে চললো। উদ্দেশ্য তাদের কিছু চাই। কিছু না নিয়ে এরা যাত্রীদের সহজে ছেড়ে দেয় না। এরা যাত্রীদের অনেক সময় পথ চলার বিঘ্ন ঘটায়। এদের কিছু না দেওয়া পর্যন্ত রেহাইও নেই। আমাদের থেকে কিছু পয়সা পেয়ে মহাখুশী হয়ে আমাদের যাত্রার সুফল কামনা করে ছাত্র দু'টী বিদ্যাপিঠের দিকে চলে গেল।

গুপ্তকাশীর এক মাইল পর নালাচটি। নালার অপর নাম নালাশ্রম। পূর্বকালে এখানে রাজা নল ভগবতীর আরাধনা করেছিলেন। এখানে নলদময়ন্তী ও ভগবতী ললিতা দেবীর মন্দির আছে। নালা কেদার-বদরি পথের জংসন। কেদারনাথ দর্শনান্তে প্রত্যেক যাত্রীকেই প্রত্যাবর্তন কালে নালাচটি পর্যন্ত একই পথে ফিরে আসতে হয়। তারপর নালা থেকে বামে উৎরাই পথে মন্দাকিনীর পুল পার হয়ে বদরিনাথের পথ ধরতে হয়। এখানে পথের সংযোগ-স্থলের উপর একটা কাষ্ঠফলকে লেখা আছে পথের দূরত্ব। নালা থেকে কেদারনাথের দূরত্ব চব্বিশ মাইল, চামোলীর দূরত্ব ত্রিশ মাইল, নালা থেকে উখীমঠ হয়ে বদরিনাথের দূরত্ব সাতাত্তর মাইল।

কেদারনাথের চব্বিশ মাইল পথ সবটাই চড়াই। চড়াই পথে ওঠা কঠিন তার উপর পিঠে বোঝা নিয়ে চড়াই ঠেলে ওঠা আরো কঠিন। তাই পিঠের বোঝা হাল্কা করার জন্যে নালা চটিতে আরো কিছু জিনিসপত্র

একটা ব্যাগে পুরে চটিওয়ালার জিম্মায় রেখে দিলাম। আজই আমাদের ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে কেদারনাথ পৌঁছবার কথা। কেদারনাথ না পৌঁছনো অবধি মনে স্বস্তি নেই।

নালার এক মাইল পর ভেতা চটি। ভেতায় ভদ্রেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। ভেতা থেকে কিছু দক্ষিণ দিকে এক পথ নেমে গিয়েছে। সেই পথে সাড়ে তিন মাইল দূরে মন্দাকিনীর অপর পারে কালীমঠ নামে এক পীঠস্থান আছে। যাত্রীদের অনেকেই কালীমাতা দর্শন করতে যায়।

ভেতার দু'মাইল পর বুঙ্গমলা চটি। এখানকার কাঠের বাসন বিখ্যাত। অনেক যাত্রী তীর্থের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ঐসব কাঠের বাসন কিনে যায়। পথে আরো দু'এক জায়গায় কাঠের বাসন পাওয়া যায়।

বুঙ্গমলা চটির পর মৈখণ্ডা। স্কন্দ পুরাণে লেখা আছে যে, পুরাকালে দেবী ভগবতী মৈখণ্ডায় মহিষমর্দিনী রূপ ধারণ করে মহিষাসুরকে খণ্ড-বিখণ্ড করে কেটে পাহাড়ের উপর ফেলে দেন। তদবধি এইস্থান মহিষখণ্ড ওরফে মৈখণ্ডা নামে প্রচলিত। দেবী মহিষমর্দিনীর মন্দিরটিও খুব প্রাচীন। মন্দিরের সম্মুখে বাঁধান এক চত্বর আছে। চত্বরের একদিকে একটি মস্ত লম্বা দোলনা আছে। শোনা যায় এই দোলনাটি পাণ্ডবরা প্রতিষ্ঠিত করে যান। পাণ্ডবদের এই দোলনা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি বোঝা গেলনা। পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠিত বলে এই দোলনায় তীর্থযাত্রীরা একবার করে দোল খেয়ে নেয়। অসুরদলনী দেবী ভগবতীকে প্রণাম করে মৈখণ্ডা পরিত্যাগ করে এগোতে থাকি।

পরপর ফাটা ও বাদলপুর চটি অতিক্রম করে বেলা দেড়টার সময় রামপুর চটিতে এসে হাজির হলাম। শরীর এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে এখান থেকে আর একটি পাও নড়তে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া উদরানল ভীষণভাবে জ্বলে উঠেছে। তাড়াতাড়ি পথের ধারে একটা দোকান থেকে কিছু গরম পুরী কিনে তিনজনে

ভাগাভাগি করে খেয়ে নিলাম। এখন প্রয়োজন একটু বিশ্রামের। এসে উঠলাম ধর্মশালায়। একটু ফাঁকা জায়গা দেখে কাঁধ থেকে পিঠঝুলি নামিয়ে একটা চাদর পেতে তিনজনেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি।

হঠাৎ কোথা থেকে দক্ষিণ ভারতের একদল মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে আমাদের ঘিরে কথাবার্তা সুরু করে দিল। তাদের কথা কিছু যদিও বোঝা গেল না, তবে আন্দাজে ব্যাপারটি আঁচ করে নিলাম। এরা আমাদের এখানে শুতে দিতে নারাজ, এই জায়গাটি নাকি ওদের দখলে। ধর্মশালার খালি জায়গা কারুরই দখলে থাকেনা। এই কথাটি হয়তো ঐসব যাত্রীদের জানা ছিলনা। আমরা যদি জোর করতাম তো কারুরই ক্ষমতা ছিলনা যে আমাদের এখান থেকে সরায়। এটা ধর্মশালা। সব যাত্রীরই এখানে সমানাধিকার। কিন্তু আমরা এত বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তখন আর কিছুই ভাল লাগছিল না। তার ওপর ঐ দক্ষিণ ভারতীয়দের দুর্বোধ্য ভাষা আমাদের আরো বেশী উত্যক্ত করে তুলছিল। তল্পিতল্পা গুটিয়ে হাজির হলাম একটা দোকানে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার পথ চলা সুরু করলাম।

আজ আর বোধহয় কেদারনাথ পৌঁছনো সম্ভব হবে না। কারণ ত্রিযুগীনারায়ণ পৌঁছতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সেই কারণে ত্রিযুগীনারায়ণে রাত্রিবাস করার মনস্থ করলাম। আরো কিছুটা পথ অতিক্রম করার পরই সুরু হবে ত্রিযুগীর চড়াই। সমগ্র উত্তরাখণ্ডের মধ্যে ত্রিযুগীর চড়াই নাকি সবচেয়ে কঠিন চড়াই। পথে ফিরতি লোক মুখে ত্রিযুগীনারায়ণের চড়াই সম্বন্ধে অনেক ভীতিপ্রদ কথা শুনে আসছি। যাকেই জিজ্ঞাসা করি, ত্রিযুগীর চড়াই কি রকম মশাই? সকলের মুখেই এক উত্তর—হ্যাঁ, চড়াই তো চড়াই, ত্রিযুগী কা চড়াই। কেউ বলে, মশাই পারলে ত্রিযুগীর নীচ দিয়েই যাতায়াত করবেন। পথে ত্রিযুগীর চড়াই সম্বন্ধে নানারকম কথা শোনার ফলে ত্রিযুগীর চড়াইয়ে ওঠার কৌতূহল বেড়ে যায়।

রামপুর চটির প্রায় মাইল দেড়েক দূরে পথ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। একটি গিয়েছে চড়াইয়ের পথে ত্রিযুগীনারায়ণের দিকে, অপরটি চড়াইয়ের ঠিক নীচ দিয়ে গিয়েছে কেদারনাথের দিকে। ত্রিযুগীনারায়ণের চড়াইয়ের সুরুতে একটা কাষ্ঠ ফলকে লেখা আছে, ত্রিযুগীনারায়ণের দূরত্ব তিন মাইল। তিন মাইল পথই সোজা উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। কঠিন চড়াই। যেসব যাত্রীরা চড়াই ভেঙ্গে উঠতে অসমর্থ তারাই কেবল চড়াইয়ের নীচের পথ দিয়ে যাতায়াত করে। পঞ্চা ও বিমলকে পিছনে রেখে আমি একলাই ত্রিযুগীর চড়াইয়ের অনেকটা এগিয়ে পড়েছি। কিছুটা দূর ওঠার পর একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি খালি পায়ে আর একটা ছাতা সম্বল করে বেরিয়েছেন তীর্থপরিক্রমায়। অজ্ঞাতসারেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গী হয়ে গেলাম। ব্রহ্মচারী আর আমি গল্প করতে করতে বেশ জোর কদমে চড়াই ভেঙ্গে উঠে চলেছি। মাঝে মাঝে বসে একটু করে দম নিতে হচ্ছিল। সত্যি ত্রিযুগীর চড়াই বেশ কঠিন চড়াই। এপথে খুব ষ্ট্রং হার্টের দরকার। যাদের হার্ট ডীজিস্ আছে তাদের এপথে না আসাই ভাল।

আরো কিছুটা আসার পর দেখলাম যে সামনের পথ ক্রমশঃ খাড়া হয়ে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গারোহণ করছি। একে কঠিন চড়াই তার উপর পথও তেমন সুবিধাজনক নয়। কোথাও দু'হাত, কোথাও বা আড়াই হাত চওড়া সঙ্কীর্ণ পথ। পথের একদিকে যেমনি অত্যুচ্চ পর্বত, অপরদিকে তেমনি ভয়াবহ গভীর খদ। উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। ছোট বড় অসমান পাথর টপকে হাতের লাঠি বেশ করে বাগিয়ে ধরে ধীরে ধীরে উঠে চলেছি ত্রিযুগীর চড়াইএ। পাহাড়ে ওঠার সময় সঙ্গে অন্য কিছু থাক আর নেই থাক, একটা লাঠি না হলে একপাও যেন এগোনো যায় না। পাহাড়ে ওঠানামার সময় লাঠি যাত্রীদের বাড়তি পায়ের কাজ করে। এই পথে ব্রহ্মচারীকে নিয়ে যাত্রী আমরা মাত্র চার জন। তাও ছাড়া

ছাড়া চলেছি, কেউ সামনে, কেউ পিছনে। হাপরের মত বুকগুলো সব ওঠানামা করছে, কারুর মুখে আর কথা নেই। এত ঠাণ্ডায় তবু আমরা ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ, নিঃশ্বাস রোধ হবার উপক্রম, প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে। তবুও পথচলার বিরাম নেই।

হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। আরম্ভ হলো মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটা তো নয় যেন এক একটি শেল এসে শরীরে বিঁধছে। পথে দাঁড়াবারও কোন জায়গা নেই। পথের প্রায় মাঝখানে আছে শাকম্ভরী দেবীর মন্দির। মন্দিরে না পৌঁছনো পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই। মন্দিরে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সবাই ভিজে গিয়েছি। আমাদের অল্প একটু পরেই পঞ্চা ও বিমল ভিজতে ভিজতে এসে হাজির হলো। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত পথ চলাও মুস্কিল। এখানে অত্যধিক ঠাণ্ডা। সারাদেহে কম্বল জড়ানো সত্ত্বেও ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। ঠাণ্ডায় সমস্ত দেহ যেন জমে আসছে। এই অবস্থায় গরম চায়ের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এপথে স্ত্রীপুরুষ সকলেই এই একটিমাত্র জিনিসের পরম ভক্ত হয়ে ওঠে। যাত্রী যত ঠাণ্ডার রাজ্যে এগিয়ে যায় চা পানের মাত্রাও তত বেড়ে যায়। বাইরে মুষলধারে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে, থামার নামটি পর্যন্ত নেই। কতক্ষণই বা চুপচাপ একজায়গায় বসে থাকা যায়? তাই মন্দিরের পূজারীকে শাকম্ভরী দেবীর মাহাত্ম্য কথা শোনাতে অনুরোধ করলাম। দেবী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সেদিন পূজারী যা বলেছিলেন সংক্ষেপে এই—মহাপ্রস্থানের সময় পাণ্ডবরা এখানে এসে শাকম্ভরী দেবীকে নিজেদের জীর্ণবাস অর্থাৎ পুরানো বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পূজা করে যান। পাণ্ডবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যাত্রীরা আজও শাকম্ভরী দেবীকে জীর্ণবস্ত্র দিয়ে পূজা করে। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড মন্দিরে পূজারীরাই যাত্রীদের কাছে বিক্রি করে থাকেন। মন্দিরাভ্যন্তরে শাকম্ভরী দেবী ও অন্যান্য কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি আছে।

বৃষ্টির জন্যে শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরে অনেকখানি সময় নষ্ট হলো। ত্রিযুগীনারায়ণে পৌঁছবার জন্যে আমরা সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছি। বৃষ্টির মধ্যে রওনা হবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না, কারণ আমাদের তিনজনের কাছেই ছাতা কিংবা বর্ষাতি কিছুই ছিল না। পরে বুঝেছিলাম যে উত্তরাখণ্ড ভ্রমণের সময় লাঠির মত বর্ষাতিরও বিশেষ প্রয়োজন। অনেকক্ষণ একটানা বর্ষণের পর আস্তে আস্তে বৃষ্টি ধরে এলো। বৃষ্টি থামতেই আমরাও পথ চলার কাজ সুরু করে দিই। বৈকালের দিকে ১১,০০০ ফিট উচ্চে চিরসবুজ বনানী শোভিত পাহাড়ের কোলে ঈপ্সিত ত্রিযুগীনারায়ণ তীর্থে এসে হাজির হলাম। এখানেও অত্যধিক ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডার জন্যে চটিতে না উঠে কালী-কম্বলীর ধর্মশালায় এসে আশ্রয় নিলাম।

বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশে মেঘের ঘোর তখনো কাটেনি, সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ধর্মশালায় জিনিসপত্র রেখে ভিজে পোষাক বদল করে তিন যুগের দেবতা নারায়ণকে দর্শন করবার জন্যে সরাসরি মন্দিরে এসে হাজির হলাম। এসে দেখি দেবতার দ্বার রুদ্ধ। কিছুক্ষণ পর, অবশ্য মন্দিরের দরজা খোলা হবে। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। গঙ্গোত্রীর পায়ে হাঁটা পাহাড়ী পথ এখানে এসে মিলিত হয়েছে। যে সব যাত্রী প্রথমে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী যান তাদের অনেকেই ফেরার পথে ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে কেদারনাথ ও বদরিনাথ দর্শন করে চারধাম তীর্থ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে যান। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার ও বদরি এই হলো উত্তরাখণ্ডের চারধাম।

একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মন্দিরের দরজা খোলা হতেই আমরা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করি। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে প্রথমেই সামনে পড়ে বিরাট এক অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ড। তার পাশে একটা ছোট অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নারায়ণের মূর্তি আছে। ইনিই তিন যুগ ধরে এই স্থানে অবস্থান করছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে যজ্ঞকুণ্ড সম্বন্ধে কেদারখণ্ডে লিখিত আছে যে, সত্যযুগে নারায়ণকে সাক্ষী করে হর-পার্বতীর বিয়ের

সময় এই যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল, সেই সত্যযুগ থেকে যজ্ঞকুণ্ড/ নাকি অনির্বাণভাবে জ্বলে আসছে। ক্ষীণ দীপালোকের সাহায্যে দেবতা নারায়ণকে দর্শন করলাম।

তিন যুগের সাক্ষী নারায়ণকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে ত্রিযুগীনারায়ণ তীর্থ। মন্দিরের পূজারী আমাদের ললাটে যজ্ঞকুণ্ডের বিভূতি লাগিয়ে দিলেন। বিভূতি বিভূষিত হয়ে ত্রিযুগীনারায়ণকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম।

মন্দির প্রাঙ্গনে রুদ্রকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড প্রভৃতি পাঁচটি জলের কুণ্ড আছে। রুদ্রকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নান ও প্রদক্ষিণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বিষ্ণুকুণ্ডের জলে মার্জন ও সরস্বতী কুণ্ডের জলে তর্পন ও শ্রাদ্ধাদি কার্য করার বিধি আছে। সরস্বতী কুণ্ডের সংলগ্ন ধর্মশীলা আছে। এখানে ভূর্জিদান, গোদান, অন্নদান ইত্যাদি যতকিছু দান আছে যাত্রীদের সামর্থানুযায়ী পূজারী ব্রাহ্মণরা করিয়ে থাকেন। সব দান গ্রহণের অধিকারী পূজারী ব্রাহ্মণরা। মন্দির থেকে ফেরার পথে ধর্মশালার কাছে একটি দোকানদারের সঙ্গে রাত্রের আহারের বন্দোবস্ত করে নিলাম। ধর্মশালায় ফিরে ঘরের চারিদিক বন্ধ করে মোমবাতি জ্বেলে কোন রকমে বিছানাটা বিছিয়ে সকলে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় পূজারী ব্রাহ্মণের এক ছড়িদার এসে জানিয়ে দিয়ে গেল মন্দিরে আরতি হচ্ছে। ত্রিযুগী-নারায়ণের সন্ধ্যা আরতি দেখার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্যে মন্দিরে যাওয়া হলো না। রাত আটটার সময় দোকানদার আমাদের জন্যে গরম পুরী আর মুখহাত ধোয়ার জন্যে এক হাঁড়ি ফুটন্ত জল নিয়ে হাজির হলো। কোনরকমে কম্বলের ভিতর থেকে মুখটা বার করে দু'চারখানা পুরী খেয়ে গরম জলে মুখহাত ধুয়ে আবার সর্বাঙ্গে কম্বল টেনে নিলাম। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি ছাড়া কারুর মুখে আর কথাটি পর্যন্ত নেই। পঞ্চা দোকানদারের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে, তাকে একটা হাঁড়ি







করে কিছু কাঠের আংরা ঘরের মধ্যে রেখে যেতে বললো। সে বেচারা আমাদের কষ্ট দেখে পঞ্চার কথামত একটা হাঁড়ি করে কিছু কাঠের আংরা আমাদের ঘরে মধ্যে রেখে গেল। এখানে ধর্মশালায় আশ্রয় নেওয়ার একটা সুবিধে আছে। ইচ্ছামত ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করা যায়। কিন্তু চটিগুলোতে সে সুবিধে নেই। চটিগুলোর দরজা জানলা বলে কিছু নেই। তিন দিক দেওয়াল দিয়ে বন্ধ আর সামনের দিক একেবারে খোলা। এখানে এসে ধর্মশালায় না উঠে, যদি কোন চটিতে উঠতাম, তা'হলে বোধ হয় আমাদের সকলকেই এই ত্রিযুগী-নারায়ণ তীর্থে ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে পড়ে থাকতে হতো।

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙ্গলো, আকাশ তখন একেবারে ফর্সা হয়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডার জন্যে পথে নামতে আর ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু পথে নামতেই হবে। পথ যে এখনো অনেক বাকি। বাধ্য হয়ে শীতের জড়তা কাটিয়ে পিঠঝুলি কাঁধে তুলে নিয়ে আবার পথ চলায় মন দিতে হলো। এবারের পথ উৎরাই। পথের দু'পাশে সুবিশাল তরুশ্রেণী, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, কোথা থেকে নাম না জানা ফুলের সুমিষ্ট সৌরভ—অদ্ভুত পরিবেশ, প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে নিজেকে এখানে ছড়িয়ে দিয়েছে। ত্রিযুগীনারায়ণের তিন মাইল নীচে সোমদ্বারা। সোমদ্বারার অপর নাম শোনপ্রয়াগ। শোননদী ও মন্দাকিনীর মিলন সংঘটিত হয়েছে এখানে। কেদারনাথ পর্বতের উপরে বাসুকীতাল হ্রদে শোননদীর জন্ম। তাই লোকে শোননদীকে বাসুকীগঙ্গাও বলে থাকে। সোমদ্বারা থেকে কেদারনাথ অবধি পথ সুদীর্ঘ চড়াই।

পঞ্চা ও বিমলকে পিছনে রেখে একলাই অনেকখানি পথ এগিয়ে পড়েছি। পথ জনমানবহীন। যাত্রী চলাচল তখনো সুরু হয়নি। পূর্বেই বলেছি যে আকাশ বেশ ফর্সা না হলে এ-পথে কোন যাত্রীই যাওয়া আসা করে না। আমরা কিন্তু পথ চলতাম আকাশ ফর্সা হওয়ার

অনেক আগে। এতে ভাল ফলই হতো। রোদ ওঠার আগে অনেক খানি পথ চলা যেত। রোদ ওঠার পর পথ চলতে আসে ক্লান্তি। তখন অল্প চলার পর এই হিমাচল রাজ্যেও গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়। বেশী পথ আর চলা যায় না। সামান্য চড়াই কিংবা সামান্য উৎরাইএ যাত্রীদের শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। সব জিনিসের যেমন কলা-কৌশল আছে হিমালয় পার্বত্য পথে চলারও তেমন কলা-কৌশল আছে। হিম-তীর্থ কেদার-বদরি যাত্রার পূর্বে বিভূতিদা পার্বত্য পথে চলার কৌশলটি শিখিয়ে বলে দিয়েছিলেন, সূর্য ওঠার যত আগে পার পথ চলবার চেষ্টা করবে। তা হলে অনেকখানি পথ বিনা ক্লেশে পৌঁছে যাবে। বিভূতিদা অভিজ্ঞ মানুষ, কেদার-বদরির পথে, যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রীর পথে ঘুরেছেন বারকয়েক। তার কথামত আমরাও হিমালয়ের পার্বত্য চড়াই-উৎরাই পথ মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছি।

ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে গৌরীকুণ্ডের দূরত্ব হলো সাত মাইল। গৌরী কুণ্ডে পৌঁছে দেখি যাত্রীরা সব রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এখানকার আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য হলো—গৌরীদেবীর মন্দির আর তপ্তকুণ্ড। মন্দিরটি খুবই প্রাচীন। মন্দিরের ভিতর হর-পার্বতী, লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি আছে। মন্দির প্রাঙ্গনে অবস্থিত দু'টি জলের কুণ্ড যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুণ্ড দু'টির মধ্যে একটি গরম জলের, নাম তপ্তকুণ্ড, অপরটি শীতল জলের, নাম গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ডের জল শীতল ও হরিদ্রাবর্ণ। গৌরীকুণ্ডটিকে দেখিয়ে পাণ্ডারা যাত্রীদের কাছে বলে থাকে—গৌরীদেবী এই কুণ্ডের জলে ঋতুস্নান করেছিলেন। তদবধি এই কুণ্ডের নাম গৌরীকুণ্ড এবং এইস্থান পবিত্র গৌরীতীর্থ নামে প্রচলিত।

তীর্থস্থানের উৎপত্তি ও তার মাহাত্ম্য কাহিনী তীর্থ-পাণ্ডাদের সব কণ্ঠস্থ। এসব না জানলে পাণ্ডাদেরই বা চলবে কেন ? হিমাঞ্চলের তীর্থগুলোতেও পাণ্ডা আছে। তাই বলে ভারতের অন্যান্য তীর্থের পাণ্ডাদের মত উত্তরাখণ্ডের পাণ্ডাদের কোন জোর-জুলুম নেই।

যাত্রীরা ইচ্ছা করে পাণ্ডাদের হাতে যা তুলে দেয়, পাণ্ডারা তাতেই সন্তুষ্ট হয়। তাছাড়া উত্তরাখণ্ডের পাণ্ডাদের ব্যবহারটি বেশ ভাল, যাত্রীদের আপদে বিপদে এরা খুবই সাহায্য করে থাকে।

তপ্তকুণ্ডের জল বেশ গরম। ফুটন্ত জল থেকে যেমন ধোঁয়া বার হয়, এই কুণ্ডের জলেও সেই রকম ধোঁয়া বার হতে দেখা যায়। ধর্মার্থী যাত্রীরা গৌরীকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড, দুই কুণ্ডের জলেই সঙ্কল্প করে স্নান করে। বিশেষ করে কুমারী ও সধবা মেয়ে যাত্রীরা গৌরীকুণ্ডের জলে স্নান করে। গৌরীকুণ্ড এ অঞ্চলে বেশ উল্লেখযোগ্য চটি। উচ্চতায় ৬৫০০ ফিট। এখানে সরকারী ডাকবাংলা, ধর্মশালা, ডাক্তারখানা ও প্রায় তিরিশটি চটি আছে। পঞ্চা ও বিমলের অপেক্ষায় এখানে অনেকক্ষণ বসে সময় কাটালাম। ইতিমধ্যে অনেক যাত্রী চলা স্থুরু করে দিয়েছে। ওদের আসার কোন লক্ষণ না দেখে আমিও পথে নেমে পড়লাম। সকলেই সারি বেঁধে মন্থর গতিতে পাহাড়ের চড়াই পথে উঠে চলেছে। দূরে পাহাড়ের উপর থেকে দেখলে মনে হয় একটা রঙীন সুতোর রেখা যেন ক্রমাগত উপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দল বেঁধে, সারি দিয়ে এক সাথে চলেছে সব। আমিই কেবল দলছাড়া, সঙ্গীহারা হয়ে চলার নেশায় উন্মত্ত হয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলেছি এগিয়ে, উপরের দিকে— আরো উপরে। এ চলার এত উদ্বেগ কেন, তা নিজেই জানিনা।

"কে জানে কোন সুর
মত্ত পাখায় উড়িয়ে নে যায়
দূর হতে কোন দূর।"

গৌরীকুণ্ডের দু'মাইল পর চীরবাসা ভৈরব, অরণ্যময় তপোভূমি। কেদারনাথের দ্বারপাল কালভৈরবের বাসস্থান। কথিত আছে যে, কালভৈরবকে বস্ত্রখণ্ড দান করে সন্তুষ্ট করলে কেদারনাথ দর্শনে সুফল লাভ হয়, নচেৎ তিনি যাত্রীদের কেদারনাথ দর্শনের সুফল হরণ করেন। কালভৈরবকে বস্ত্রখণ্ড দান করে যাত্রীরা এসে হাজির হয় ৮০০০ ফিট উচ্চে রামওয়ারা চটিতে।

কেদারনাথের পথে রামওয়ারাই হলো সর্বশেষ চটি। এখানেও ধর্মশালা, সদাব্রত ও খানকয়েক চটি আছে। কেদারনাথে অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্যে অনেক যাত্রী কেদারনাথ দর্শন ও পূজার্দি শেষ করে রাত্রিবাসের জন্যে কেদারনাথ পুরী থেকে নেমে এসে আশ্রয় নেয় রামওয়ারা চটিতে। ঠাণ্ডার প্রকোপ এখানেও কিন্তু কম নয়। তবে কেদারনাথপুরীর থেকে রামওয়ারা চটির ঠাণ্ডা কিছুটা কম হতে পারে। রামওয়ারার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দে বিহ্বল হয়ে সেদিন শুধু অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলাম সেই উদার অনন্ত সৌন্দর্যের দিকে। সেই সৌন্দর্যের কথা মানুষ মানুষকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না, 'অনির্বচনীয় সৌন্দর্যস্বরূপম'। সৌন্দর্যবোধ মানুষের নিজস্ব। মানুষ যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজ চোখে প্রকৃতির সৌন্দর্য-দর্শন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কণামাত্র উপলব্ধি করতে পারে না। সৌন্দর্য উপলব্ধির জিনিস, দেখার জিনিস।

"চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি,
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি,
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা।"

আর মাত্র তিন মাইল পথ বাকি। কেদারনাথ দর্শনার্থী যাত্রীরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছনোর জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। পথটুকু ফুরোলেই হয়। যাত্রীদলের মাঝ থেকে কে যেন কেদারনাথজীর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। সেই ধ্বনি মুহূর্তের মধ্যে আবার শত শত কণ্ঠে গর্জে উঠলো 'জয় কেদারনাথজী কি জয়!' বিশ্রামরত যাত্রীর দল বোঁচকা-বুঁচকি তুলে নিয়ে এগোতে লাগল সামনের লক্ষ্য বস্তুর দিকে। কারুর মুখে আর কথাটি নেই। সকলেই মুখ বুজে চলেছে। পথশ্রমে ঝিমিয়ে পড়লো নাকি যাত্রীর দল? যাত্রীদের পরখ করার জন্যে মাঝ থেকে কেদারনাথজীর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। সে ধ্বনি সকলের কণ্ঠেই

ধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো এখানকার আকাশে বাতাসে। না কেউ তো ঝিমিয়ে পড়েনি। তবে পথ চলায় এত নীরবতার কারণ কি? এই বাক সংযমের কারণ বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র দেরী হলো না। পথ চলতে চলতে অনবরত কথা কইলে চলায় বিঘ্ন ঘটে, তাছাড়া ক্রমাগত বকবক করতে করতে চড়াই উৎরাই পথে চললে অল্পক্ষণের মধ্যেই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়তে হয়, তাই বাক সংযত হলে দেখা যায় চলার সময় নীরবে পা কাজ করে বেশী। রামওয়ারা থেকে ফার্লং দুই চড়াই ভেঙ্গে আসার পর দেখা গেল প্রায় দশ বার হাত জায়গা জুড়ে পথের উপর পড়ে আছে স্তূপীকৃত জমাট বাঁধা বরফ। ঐ বরফের স্তূপের উপর দিয়েই যাত্রীদের যাওয়া আসা করতে হয়।

আরো কিছুটা চড়াই ভেঙ্গে দেবদেখনিতে পৌছনোর পর হঠাৎ চোখের সামনে নীলাকাশের গায়ে ভেসে উঠলো কেদারনাথের প্রস্তর নির্মিত মন্দির ও কেদারনাথ পুরী। দূর থেকে মন্দিরের চূড়া দর্শনে যাত্রীদের মনে সে কি আনন্দোল্লাস। সকলের মুখেই প্রসন্নতার হাসি! কত বড় আশা নিয়ে, জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করে পথের দুঃখ কষ্ট অগ্রাহ্য করে ধর্মার্থী যাত্রীরা আজ এসে পৌছেছে কেদারনাথ পুরীর প্রবেশ দ্বারে। কেদারনাথের চরণ স্পর্শ না করা অবধি যাত্রীদের মনে যেন সোয়াস্তি নেই।

আর মাত্র তিন ফার্লং পথ বাকি। চড়াই বা উৎরাই নয়, এবার পথ সমতল। পথটুকু নিঃশেষ করার জন্যে চলেছি সবাই দ্রুতপদক্ষেপে। এমন সময় পথের মাঝে আরম্ভ হলো তুষার বৃষ্টি। বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার মত পথে কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। এ অবস্থায় উন্মুক্ত পথে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া উপায়ই বা কি? হঠাৎ মাথায় একটা উপস্থিত বুদ্ধি খেলে গেল। পরণের ফুল প্যাণ্টটা খুলে পিঠঝুলির মধ্যে পুরে, সারা অঙ্গে কম্বল জড়িয়ে নিলাম। পরণে আন্‌ডারওয়ার, সর্বাঙ্গে কম্বল, মাথায় স্কাউট হ্যাট চাপিয়ে দিব্যি এক কম্বলধারী গাজনের সং সেজে চলতে

লাগলাম। এ অঞ্চলে লজ্জা সরমের বালাই বা সাজ পোষাকের পারিপাট্য নেই, তাই এ-যাত্রা কোনরকমে রক্ষা পাওয়া গেল।

কেদারনাথ পুরী যত নিকট হতে থাকে, যাত্রীদের মুখে ততই কেদারনাথজীর ধ্বনি গর্জে ওঠে। মন্দাকিনীর উপর ছোট একটা কাঠের পুল। সেই পুল পার হয়ে যখন ১১,৭৫০ ফিট উঁচুতে কেদারনাথ পুরীতে এসে পৌঁছলাম তখন পথ চলাজনিত সমস্ত পরিশ্রম যেন সার্থক মনে হলো। ধর্মশালায় কোনরকমে পিঠঝুলিটা নামিয়ে, এসে হাজির হলাম মন্দাকিনীর স্নানঘাটে। ছোট ঘাট। তার উপর স্নানার্থী যাত্রীর ভিড়ে পা ফেলা দুষ্কর। কোন রকমে ভিড় ঠেলে ঘাটের শেষ ধাপে এসে দাঁড়ালাম। স্বর্গগঙ্গামন্দাকিনী—খরস্রোতা, কলনাদিনী. হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে কলুষনাশিনী। পাপীতাপী শান্তি পায় অবগাহন স্নান করে। অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে আমিও স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর হিমশীতল জলে নেমে পড়লাম। উঃ! কি ভীষণ ঠাণ্ডা জল। সমস্ত শরীর নিমেষে জমাট বেঁধে যাবার উপক্রম। তাড়াতাড়ি তুষার গলা জল থেকে উঠে পড়লাম।

স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর ঘাটের উপরেই গঙ্গাদেবীর মন্দির। গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করে দোকান থেকে ঘি, কর্পূর ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী কিনে নিয়ে সোজা মন্দিরের দিকে ছুটলাম।

মন্দির প্রাঙ্গন ভিড়ে ভিড়। এ হেন দুর্গম হিমতীর্থে বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউই আসতে বাদ পড়েনি। এসেছে সবাই। অন্ধ, খঞ্জ যাদের আসার কথা নয়, কেদারনাথের আহ্বানে তারাও এসে মিলিত হয়েছে কেদারনাথের মন্দিরে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সামনে চত্বরের উপর বিরাট আকার মহেশ্বরের বাহন ষাঁড় উপবিষ্ট রয়েছে। পাথরের তৈরী এ ষাঁড়। নাম তার নাদেশ্বর। তারই সামনে মন্দিরের প্রবেশ ও নির্গমনের পথ। প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণে গণেশের এক মূর্তি। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পূর্বেই দ্বারদেশে অবস্থিত সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক গণেশজীর পূজা করা বিধি। তীর্থে কোনটা বিধি আর কোনটা বিধি

নয় তা পাণ্ডারাই যাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তীর্থের বেদ বিধি সবই ওদের নখদর্পণে। গণেশজীর পূজার পর পাণ্ডা ঠাকুরকে অনুসরণ করে ঢুকলাম মন্দিরাভ্যন্তরে। প্রথমেই নাটমন্দির। এখানে কুন্তী, দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডব, রাম-লক্ষণ-সীতা, গরুড়ভগবান প্রভৃতির অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর মূর্তি আছে। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে কেদার-নাথের বাহন আর একটি পিতলের ষাঁড় বিরাজিত। নাটমন্দিরের পর কেদারনাথের মূল মন্দির। আর একটি ছোট প্রবেশদ্বারের মধ্যে দিয়ে দেবতার গর্ভগৃহে পৌঁছতে হয়। ঐ প্রবেশদ্বারের দক্ষিণে পার্বতী, বামে লক্ষ্মীদেবী অধিষ্ঠিতা। গর্ভগৃহ খুবই অন্ধকার। তাই বলে তীর্থ যাত্রীদের দেবতা দর্শনে বিশেষ কোন অসুবিধে ভোগ করতে হয় না। কারণ এখানে ঘিয়ের প্রদীপ ও ডে-লাইট দিনরাত জ্বলছে। সেই আলোর উজ্জ্বল রশ্মিতে স্পষ্ট দেখা যায় কেদারনাথের বিশাল মূর্তি। কেদারনাথের মূর্তি কিন্তু লিঙ্গাকার শিব মূর্তি নয়। দেবাদিদেব এখানে ত্রিকোণাকৃতি প্রস্তর মূর্তিতে বিরাজিত। কেদারনাথ তীর্থে পৌঁছে, কেদারনাথজীকে দর্শন ও স্পর্শ করে যাত্রীরা নিজেদের জীবন ধন্য মনে করে। কেদারনাথের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করা মুহূর্তেই আমার মধ্যে আমূল এক পরিবর্তন ঘটে গেল। কাঁচা একটুকরো লোহা যেমন চুম্বক শক্তির স্পর্শে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে 'চুম্বকত্ব' প্রাপ্ত হয় দেবতার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে আমার ক্ষুদ্র অন্তরও তেমনি নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে দেবভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো। সেদিন ভারতবর্ষের দ্বাদশটি অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গের চরণতলে দাঁড়িয়ে দেবাদিদেব পরমেশ্বরের রূপ ধ্যান করতে লাগলাম।

দেবতার ধ্যানে এমনি তন্ময় হয়ে পড়েছি যে আর কিছুরই খেয়াল নেই। সমাজ, সংসার, আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। চোখের সামনে ফুটে উঠেছে কঠিন প্রস্তর মূর্তির পরিবর্তে দেবাদিদেব পরমেশ্বরের আসল সৌম্যশান্ত মূর্তি। যে মূর্তি সেদিন দু'চোখ ভরে দেখেছি তার তুলনা নেই। অন্তরে

বিশুদ্ধ প্রেম আর ভক্তি থাকলে অতি সামান্যতম মানুষের ভাগ্যেও তাঁর দর্শন ঘটে থাকে। তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না, দেখা না দিয়ে পারেন না। ভক্তেরই তো ভগবান।

মন্দিরের চাপরাশি জানিয়ে দিয়ে গেল, এখুনি মন্দিরের দরজা বন্ধ হবে। চাপরাশির ডাকে সচেতন হয়ে উঠলাম। মন্দির থেকে ফেরার আগে তখনকার মত আর একবার করপুটে আমার অন্তরের ভক্তি প্রণাম নিবেদন করলাম কেদারনাথজীর শ্রীচরণপদ্মে।

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর।"

ধর্মশালায় ফেরার পথে দোকান থেকে কিছু গরম পুরী কিনে নিলাম। ধর্মশালায় এসে সেগুলোর যথারীতি সদ্ব্যবহার করলাম। পঞ্চা আর বিমলের কিন্তু এখনো দেখা নেই। জানি না, তারা এখন পথের কত দূরে রয়েছে। ভিজে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে বসে ওদের কথাই ভাবছি। এমন সময় জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম, পরম ভক্ত কিশোর তাপসের মত দু'জনেই মুখে প্রসন্নতার হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে। বেলা একটার সময় ওরা কেদারনাথপুরীতে এসে হাজির হলো। ওদের আসার একটু আগে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই ওদের ভাগ্যে ধূলো পায়ে আর দেবতা দর্শন হলো না। ধর্মশালায় পৌঁছে পিঠঝুলি সব নামিয়ে রেখে ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে ওরা দু'জনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

কিরে কিছু খাবি না ?

পঞ্চা বললো, সে ব্যবস্থা শর্মারা পথেই সেরে এসেছে।

ওর জবাবের পর আর কোন কথা না বলে, ওদের পাশেই কম্বল মুড়ি দিয়ে আমিও শুয়ে পড়লাম। শুলে কি হবে ? তিনজনেই শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। একটা, কি দু'টো কম্বলের ঠাণ্ডা এ নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এই রাজ্যে। বাইরে চারিদিকে মস্ত মস্ত বরফের চাঁই পড়ে আছে, তার উপর ঝিম ঝিম করে বৃষ্টিও পড়ছে। আর সেই সঙ্গে প্রবল বেগে

বইছে হিমেল বাতাস। ঘুমোলে হয়তো শীতের দৌরাত্ম্য ততখানি বোঝা যাবে না। তাই ঘুমোবার চেষ্টায় চোখ বুজে চুপ-চাপ শুয়ে আছি। সবে তন্দ্রা এসেছে চোখে। ঠিক সেই সময় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একদল পশ্চিমা যাত্রী এসে আশ্রয় নিল আমাদের ঘরে।

তাদের কোলাহলে আমাদের তন্দ্রা গেল টুটে। অত হট্টগোলের মাঝে কি আর ঘুমানো যায়? ঘুম আর হলো না। বৃষ্টি না হলে কেদারনাথ পুরীর চারিপাশ ঘুরে বেড়িয়ে দেখা যেত। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বার হওয়া মুস্কিল। কোন যাত্রীই বাইরে নেই। সকলেই যে যার আশ্রয়ে বন্দী। এই বৃষ্টি আর হাড় কাঁপুনি ঠাণ্ডার মধ্যে ঠাকুমাকে যদি কাছে পেতাম, তাহলে কি মজাটাই না হতো। ঠাকুমার কোলের ভিতর গুড়ি স্লুড়ি মেরে বসতাম আর ঠাকুমা আঁচল জড়িয়ে নিয়ে বসে খুলতেন তাঁর গল্পের ঝাঁপি। ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীর গল্প অথবা রাজপুত্তুর রাজকন্যার গল্প। ঠাকুমার গল্প শুনতে শুনতে সময়টাও বেশ কেটে যেত। একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেতাম। তাই এই হিমশীতল জমাটি আবহাওয়ায় ঠাকুমার অভাব অনুভব করলাম, ঠাকুমার অভাব পূরণ করলো ঐ পশ্চিমা যাত্রীদলের পাণ্ডার এক ছড়িদার। যাত্রীদের মধ্যে বসে সুরু করল, খাস কেদারনাথের গল্প।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা গুরু হত্যা, জ্ঞাতি হত্যা ইত্যাদি পাপে কলুষিত হন। পাণ্ডবরা পড়লেন ভীষণ চিন্তায়। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তপস্যায় জানতে পারলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীমুখ দর্শন করলে তাঁরা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন। তখন পাণ্ডবরা মহাদেবের শ্রীমুখ দর্শনের আশায় ছুটলেন কাশীতে। বিশ্বনাথ এই ব্যাপার জানতে পেরে কাশী থেকে সরে পড়লেন। ঠিক করলেন, গুরু হত্যা, জ্ঞাতি হত্যাকারী পাণ্ডবদের দেখা দেবেন না। তখন মহাদেব আর পাণ্ডবদের মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলতে লাগলো।

মহাদেবকে একদিক থেকে তাড়া দিতে সুরু করলেন। মহাদেবকে ধরে ফেলে ফেলে অবস্থা, এমন সময় গাড়োয়াল হিমালয়স্থিত রাম-

ওয়ারার কাছে এসে দেবাদিদেব মহেশ্বর এখানকার রাক্ষস রাজার মহিষের দলের মধ্যে মহিষরূপ ধারণ করে আত্মগোপন করলেন। মহাদেবের সন্ধান না পেয়ে পাণ্ডবরা বেশ একটু মুস্কিলে পড়লেন। তখন তাঁরা গণনা করে জানতে পারলেন যে, মহাদেব এইখানে মহিষরূপ ধারণ করে আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু অতগুলো মহিষের মধ্যে মহিষরূপী মহাদেবকে খুঁজে বার করা পাণ্ডবদের পক্ষে একটু শক্ত হয়ে উঠলো।

এমন সময় পাণ্ডবদের মাথায় একটা বুদ্ধি গজালো। মধ্যম পাণ্ডব ভীম মাঠের একদিকে দুটো খুঁটি পুঁতে তার উপর নিজে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। আর বাকি পাণ্ডবরা মহিষগুলো তাড়া দিতে লাগলেন। পাণ্ডবদের তাড়া খেয়ে সব মহিষ এক এক করে ভীমের পায়ের তলা দিয়ে গলে পার হয়ে গেল, কেবল গেল না একটি মহিষ। সে মাঠের চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো। পাণ্ডবদের বুঝতে আর দেরী হলো না। সকলে মিলে তখন চীৎকার করে বলে উঠলেন,ছোট শিং বড় চোখ, ইনিই মহাদেব। আর যায় কোথায়। ভীম প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে পড়লেন ঐ মহিষটির উপর। মহিষরূপী মহাদেব তখন অন্য উপায় খুঁজে না পেয়ে শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ে ধরণীর মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। নিজের খানিকটা অংশ তিনি ধরণীর মধ্যে লুকিয়েও ফেললেন। বাকি অংশটা পাণ্ডবরা জোরে চেপে ধরলেন, যাতে মহাদেব সম্পূর্ণভাবে নিজেকে গোপন করতে না পারেন। মাটির মধ্যে লুকানো অংশটুকু বার করবার জন্যে ভীম গদা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগলেন। সব শ্রমই পাণ্ডবদের পণ্ডশ্রমে পরিণত হলো। তাই বলে তাঁরা হতাশ হলেন না। আঁকড়ে ধরে রইলেন মহিষের পশ্চাৎ ভাগ।

মহাদেবের শ্রীমুখ দর্শনের জন্যে পাণ্ডবরা আর কোন উপায় না পেয়ে মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন, যদি কোন সুফল ফলে—ফললোও তাই। পাণ্ডবদের একনিষ্ঠ তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে

দেবাদিদেব মহাদেব তাঁদের দর্শন দিলেন। পাণ্ডবরা মহাদেবের শ্রীমুখ দর্শনের পর মহাদেবকে পূজা অর্চনা করে, পাপ বিমুক্ত হয়ে এখান থেকে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন।

মহিষের যে অংশটি পাণ্ডবরা আঁকড়ে ধরেছিলেন—সেই অংশটুকুই এখানে পাষাণ হয়ে আছে। ভীমের গদার আঘাতে মহিষরূপী মহাদেবের দেহ খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে যায়। মুখ ব্যতীত মহাদেবের দেহের খণ্ডিত অংশ পঞ্চ-কেদারে বিভক্ত হয়ে সমগ্র উত্তরাখণ্ডে বিরাজমান।

মহিষরূপী মহাদেবের পশ্চাৎ ভাগ যে অংশে অবস্থিত সেই স্থানের দেবতা হলেন কেদারনাথ। আর বাকি চার কেদার হলেন—মধ্যমেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর। কেদারনাথ পর্বতের কিছু দূরে দূরে উক্ত চার কেদার অবস্থিত। কেবল তুঙ্গনাথ ছাড়া বাকি তিন কেদারের পথ দুর্গম। যাত্রীরা বড় একটা ঐ সব কেদার দর্শনে যায় না। তুঙ্গনাথের পথও তেমন সুগম নয়। কেদারনাথ দর্শনের পর নেপালে পশুপতি নাথ দর্শন না করলে কেদারনাথ দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ মহাদেবের পশ্চাৎভাগ দর্শন করলে মুখ দর্শন করতে হয়। নচেৎ কেদারনাথ দর্শনের কোন ফলই হয় না। মহাদেবের মুখমণ্ডল নেপালে অবস্থিত। তাই প্রত্যেক পুণ্যকামী যাত্রীদের কেদারনাথ দর্শনের পরই নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করার ইচ্ছা জাগে।

রাত সাতটার সময় একজন পাণ্ডা এসে জানিয়ে দিয়ে গেল, মন্দিরে দেবারতি হচ্ছে। দেবারতি দেখতে যাওয়ার জন্যে পঞ্চা ও বিমলকে বললাম। ওরা বৃষ্টি আর ঠাণ্ডার মধ্যে যেতে রাজি হলো না। বিমল বললো, কাল সকালে একেবারে কেদারনাথ দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সেরে রওনা হব।

তথাস্তু। আমি একলাই বৃষ্টি আর ঠাণ্ডাকে অগ্রাহ্য করে সর্বাঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম কেদারনাথের মন্দিরে। আরতি সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টি ও অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্যে আরতি দর্শনার্থীর ভিড়ও তেমন হয়নি। পূজারী আরতি করছেন আর একদল

সুমিষ্ট কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। আরতির সময় কেদারনাথকে ফুল এবং মণি-মাণিক্য খচিত এক পীতবস্ত্র দিয়ে আগাগোড়া.. ঢেকে দেওয়া হয়। এই হলো কেদারনাথের রাজবেশ। সকালে কেদারনাথ থাকেন নির্বাণ বেশে। তখন দেবতার শ্রীঅঙ্গ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে। সেই সময় সকল যাত্রী দেবতাকে দর্শন ও স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু রাত্রে আরতির সময় কোন যাত্রীকেই গর্ভগৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। তখন নাট-মন্দিরে দাঁড়িয়ে দেবতা ও দেবারতি দর্শন করতে হয়। কেদারনাথের আরতির পর পূজারী এক এক করে অন্যান্য দেবদেবীর আরতি করলেন। আরতি শেষ হতেই কেদারনাথকে প্রণাম করে নিজ ডেরায় ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্যে ঘুমোনো গেল না। তাছাড়া ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার মত পর্যাপ্ত গরমের পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের কারুরই ছিল না। তাই এই দুর্ভোগ। ঘুম যখন হলোই না তখন মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। আমাদের পাশে যে সব যাত্রী পাণ্ডার দেওয়া দু'তিনটে করে কম্বল মুড়ি দিয়ে বেশ আরাম করে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলো, তাদের গা থেকে কম্বলগুলো খুলে নিয়ে নিজেদের গায়ে ঢাকা দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর দেখি ওরা উঠে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হলো না। আমরাও যাতে ধরা না পড়ি, এইরূপ ঘুমের এক ভান করে নাক ডাকা সুরু করে দিলাম। ওরা আলো জ্বেলে দেখলো যে, আমাদের গায়েই ওদের কম্বলগুলো রয়েছে। ঠেলাঠেলি করতে লাগলো, এ মহারাজ, হামলোগকা কম্বল লেকর, জাড়া মে দিল্লাগি করতা হ্যায় ?

দিল্লাগি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই মাত্রা আর না বাড়িয়ে মানে মানে কম্বলগুলো ওদের ফিরিয়ে দিলাম। কোন কথা না বলে

কম্বল মুড়ি দিয়ে ওরা যে যার আবার শুয়ে পড়লো। এদিকে আমাদেরও আর ঘুম হলো না। বাকি রাতটা এপাশ ওপাশ করেই কাটলো।

রাত প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত কেদারনাথ পুরী আবার জেগে উঠলো। আজ ১৬ই মে, অক্ষয় তৃতীয়া। প্রধানতঃ এই দিনেই কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খোলা হয়। এবারে অক্ষয় তৃতীয়ার কয়েকদিন আগেই মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছে। কেদারনাথের মন্দির খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রীদলের আসা যাওয়া সুরু হয়ে যায়।

কেদারনাথ পুরীতে পৌঁছে যে সব যাত্রী আমাদের মত ধর্মশালায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সকাল হতেই তারা সব ধর্মশালা খালি করে চলে গিয়েছে মন্দিরে। আমরা তিনজনই শুধু কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখি—আরো কত নতুন যাত্রী আসছে। গত দিন যে সব যাত্রী এসে পৌঁছেছে, তারা প্রায় সবাই স্বর্গগঙ্গামন্দাকিনীর পীযূষ ধারায় অবগাহন স্নান করে মৃদু মন্থর গতিতে চলেছে দেবতার পূজা দিতে মন্দিরের দিকে। তাদের এক হাতে মন্দাকিনীর জলপূর্ণ পাত্র, যে পবিত্র জল দেওয়া হবে কেদারনাথের মাথায়, অপর হাতে দেব-পূজার উপচার, মুখে প্রসন্নতার হাসি। এদের কাউকে দেখলে আজ আর মনে হয় না যে এরা গত কাল পর্যন্ত পথ চলায় কি ভীষণ কষ্টই না করেছে।

হিমালয়ে পথ চলায় কষ্ট আছে যথেষ্ট। কিন্তু আরাধ্য দেবতার দর্শন পেতে হলে কষ্ট তো ভোগ করতেই হবে। তাই দেবতার দর্শনাকাঙ্ক্ষী তীর্থযাত্রীরা নীরবে সহ্য করে যায় পথের যাবতীয় দুঃখকষ্ট। পথের শেষে, ঈপ্সিত দেবতার শ্রীমূর্তি দর্শন লাভের পর মুহূর্তেই যাত্রীরা ভুলে যায় পথের সব দুঃখকষ্টের কথা। দেবতার পাদপীঠ স্পর্শে

প্রতিটি যাত্রীর অন্তর এক ঐশী শান্তিতে ভরে ওঠে। তীর্থের মাহাত্ম্যই বুঝি এই।

অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্যে কম্বল ছেড়ে বাইরে আসতে ইচ্ছা করছিল না মোটেই। তাই বলে, কেদারনাথ পুরীতে অলসভাবে শুয়ে থাকলে তো আর চলবে না। দুস্তর পথ এখনো বাকি। পথের কথা মনে পড়তেই শয্যা ছেড়ে উঠে পড়তে হলো। ধর্মশালার বাইরে এসে দেখি, প্রভাতী সূর্যের আলোকে কেদারনাথ পুরীর চারিদিক ঝলমল করছে। অপরূপ সাজে সেজেছে প্রকৃতি দেবী। যে দিকেই চোখ মেলে তাকাই না কেন—সেদিকেই শুধু প্রকৃতির সীমাহীন আনন্দের ছবি চোখে পড়ে। এ ছবির যেন পরিবর্তন নেই।

কত যুগযুগান্তর কেটে গিয়েছে, ধরিত্রীর বুকে সংঘটিত হয়েছে কত না পরিবর্তন। পরিবর্তন হয়নি শুধু হিমালয়ের। আজও হিমালয় আপন বিশালতায়, বিস্তারতায়, বৈচিত্র্যে, বিস্ময়ে, সৌন্দর্যে ও মহিমায় অচল অটল হয়ে উন্নত শিরে বৃদ্ধ তাপসের মত মৌনভাবে ধরিত্রীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে। হিমালয় যে সত্যি সত্যি দেবতাগণের আত্মাস্বরূপ তা নিজে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

প্রভাতে মন্দিরের দেবতা দর্শনের পূর্বেই প্রথম দর্শন ঘটলো দেবতাত্মা হিমালয়ের বিরাট রূপের সঙ্গে। একসঙ্গে এত রূপ, এত সৌন্দর্যের সমারোহ যেন দু'চোখ ভরে দেখেও শেষ করা যায় না। হিমালয়ের পাগলকরা রূপের নেশায় উপত্যকা, অধিত্যকা, চড়াই, উৎরাই অতিক্রম করে, পথশ্রম, অনাহার-অর্দ্ধাহার, অনিদ্রা ও নানারূপ শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেও দূরদূরান্ত থেকে যাত্রী দলে দলে ছুটে আসে হিমালয়ে। আসে হিমালয়স্থিত কেদারনাথ, বদরিনাথ তীর্থে। দেবতার পদপ্রান্তে পৌঁছে যাত্রীরা নিজেদের ধন্য মনে করে। হিমালয়স্থিত কেদারনাথের চরণতলে উপবিষ্ট হয়ে আজ আমরাও নিজেদের ধন্য মানি।

কেদারনাথের মন্দির সকাল থেকেই যাত্রীতে ভরে গিয়েছে।

অন্যান্য যাত্রীদের মত আমরাও মন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় স্নান করে জলপূর্ণ পাত্র আর দেবপূজার উপচার হাতে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে মিশে গেলাম যাত্রীদলের ভিড়ের মধ্যে। সকলেই অপেক্ষা করে আছি মন্দিরের দ্বার খোলার জন্যে। মন আজ আনন্দে ভরপুর। দ্বার খোলা হলে দর্শন করব দেবতার শ্রীমূর্তি, নিজ হাতে পূজা করব দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণ। ধন্য হব আমি। সার্থক হবে আমার জন্ম।

কেদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ করার আগে যাত্রীদের নাম রেজেস্টারী করতে হয়। তারপর ক্রমিক সংখ্যানুসারে যাত্রীরা মন্দিরে প্রবেশ করে। অত্যধিক ভিড়ের জন্যে এই ব্যবস্থা। আমাদের নাম রেজেস্টারী করার আগে বহু যাত্রীর নাম রেজেস্টারীর খাতায় লেখা হয়ে গিয়েছে। নাম রেজেস্টারী করার সময় আমাদের যে ক্রমিক সংখ্যা হাতে পেলাম সেই সংখ্যার ডাক পড়তে প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা সময় লাগবে। আমরা আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, সকাল সকাল কেদারনাথ দর্শন ও পূজাদি শেষ করে ফিরে যাব নালা চটিতে। কিন্তু এখানে যা অবস্থা দেখলাম তাতে আজ আর নালা চটিতে ফিরে যেতে পারব বলে মনে হলো না। এদিক ওদিক একবার তাকালাম, পঞ্চা ও বিমল কাউকেই দেখতে পেলাম না। গেল কোথায় ওরা ? মন্দিরের চত্বরের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ওরা দু'জনে কোথা থেকে ছুটে এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

ব্যাপার কি ?

এখুনি মন্দিরে ঢুকব—উত্তর দিলে পঞ্চা।

কিন্তু, আমাদের মন্দিরে ঢুকবার ক্রমিক সংখ্যা যে অনেক পিছনে ?

সে বন্দোবস্ত আমরা করে ফেলেছি।

ওরা দু'জনে আমায় এনে হাজির করলো একেবারে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের চৌকাট গোড়ায়। পঞ্চা আর বিমল আমার থেকে যে করিৎকর্মা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একজন পূজারী ব্রাহ্মণ আমাদের তিনজনকে সংকল্প করিয়ে প্রথমেই দ্বারে উপবিষ্ট সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করালেন। গণেশের পূজা শেষ করে প্রজ্বলিত ঘিয়ের প্রদীপ হাতে নিয়ে ভিড় ঠেলে কেদারনাথজীর সন্নিকটে উপনীত হলাম। সকলেই বাবা কেদারনাথজীকে কাতর কণ্ঠে ডাকছে। কেউ কেউ আবার কেদারনাথজীকে আলিঙ্গন করে মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করছে। এই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে আমরাও কেদারনাথজীর অঙ্গে স্বহস্তে ঘি লেপন করে আলিঙ্গন করলাম। কেদারনাথজীর অঙ্গে ঘি লেপনের প্রথা পাণ্ডবরা প্রচলিত করে যান। আজও ধর্মার্থী যাত্রীরা পাণ্ডবদের প্রথা অনুসরণ করে চলেছে। এখানকার মন্দিরের পূজারীকে পূজারী না বলে, বলা হয় রাওল সাহেব।

রাওল সাহেব আমাদের কেদারনাথজীর পূজা করালেন। পূজান্তে মন ভরে উঠলো এক পরম তৃপ্তিতে। রাওল সাহেবের মুখে শুনলাম কেদারনাথজীর দ্বিতীয় নাম—'কৃতার্থনাথ।' কেদারনাথজীর কৃপায় পাণ্ডবরা জ্ঞাতিহত্যা, গুরুহত্যাজনিত পাপরাশি থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন বলে তাঁরা সানন্দচিত্তে কেদারনাথজীকে 'কৃতার্থনাথ' নামে অভিহিত করেন। শিব হলেন বাঞ্ছা কল্পতরু। ভক্ত আপনভোলা শিবের কাছে যা বাঞ্ছা করে, শিব ভক্তের সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

পূজা শেষ করে মন্দিরের বাইরে এসে মূল মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। প্রদক্ষিণ পথে অমৃতকুণ্ড, সুফলকুণ্ড, হংসকুণ্ড, রেতঃকুণ্ড এবং উদককুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া এই হিমতীর্থে মন্দাকিনী, ক্ষীরগঙ্গা, স্বর্গদ্বারী, মহোদধি ও সরস্বতী এই পঞ্চগঙ্গার মিলন সংঘটিত হয়েছে।

জগৎগুরু শঙ্করাচার্য কেদারনাথ তীর্থে বত্রিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শঙ্করাচার্যের দেহের অবসান ঘটলেও তাঁর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের সর্বত্র।

বছরের ছ'মাস কেদারনাথ ও বদরিনাথের পথ খোলা থাকে। বৈশাখ থেকে আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত মর্ত্যলোকবাসীদের কেদার-বদরি যাত্রা সুরু হয় এবং তখন থেকেই কেদারনাথ ও বদরিনাথজীর পূজা আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে তুষারপাত আরম্ভ হয় এবং মন্দির ও পথ তুষারাবৃত হয়ে যায়। ফলে ছ'মাসের মত মর্ত্যলোকবাসীদের কেদার-বদরি যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শোনা যায়, যে ছ'মাস পথঘাট বন্ধ থাকে, সেই ছ'মাস দেবতাদের জন্যে পথ উন্মুক্ত হয়। তখন সুরু হয় দেবতাদের পূজা করার পালা। মন্দির বন্ধ করার আগে মন্দিরের মধ্যে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে আসা হয়। ঐ প্রদীপ ছ'মাস সমানে জ্বলতে থাকে।

এইবার আমাদের তুঙ্গনাথ হয়ে বদরিনাথ যাওয়ার পালা। কেদারনাথ থেকে তুঙ্গনাথ হয়ে বদরিনাথের দূরত্ব হলো একশ এক মাইল। প্রবাদ, পূর্বে নাকি কেদার-বদরি দুই মন্দিরের দূরত্ব ছিল মাত্র পাঁচ মাইল পথ। এক পূজারী ব্রাহ্মণই একদিনে কেদার-বদরি দুই মন্দিরের পূজা করতো। কোন কারণে হঠাৎ এই পথ বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে যাত্রীদের বর্তমানে একশ এক মাইল পথ চড়াই, উৎরাই করে পাহাড়ের পর পাহাড় টপকে কেদারনাথ থেকে বদরিনাথ দর্শনে যেতে হয়।

শেষবারের মত কেদারনাথজীকে প্রণাম করে পিঠঝুলি কাঁধে তুলে নিলাম। পঞ্চা ও বিমল ক্যামেরা নিয়ে ছুটলো মন্দিরের ও কেদারনাথ পুরীর ফটো তুলতে। ওদের জন্যে অপেক্ষা না করে আমি নেমে পড়েছি পথে, ওরা যখন আসে আসুক। আজই পৌছতে হবে নালা চটিতে। কেদারনাথ থেকে নালা চটির দূরত্ব চব্বিশ মাইল। নালা পর্যন্ত নেমে আসতে হবে উৎরাই পথে। পাহাড়ে চড়াই করতে যেরূপ কষ্ট হয়, উৎরাই করতে বোধকরি কষ্টের মাত্রটা কিছু বেড়ে যায়। কষ্ট যতই হোক নালা চটিতে পৌছতেই হবে। নালা চটিতে পৌছতে যখন

—৫

আর মাত্র দু'মাইল পথ বাকি এমন সময় পঞ্চা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, বিমল কোথায়?

তার পায়ে অসহ্য ব্যথা সুরু হয়েছে। সে আর হাঁটতে পারছে না।

তাকে ছাড়লি কোথায়?

কাটা চটিতে। ও বলে দিয়েছে, তার জন্যে আমরা যেন অপেক্ষা না করি। পায়ের ব্যথা ভাল হলো কাল সকালেই রওনা দেবে আর পায়ের ব্যথা ভাল না হলে সে আর একদিন কাটা চটিতে থেকে যাবে।

পঞ্চার মুখে বিমলের খবরটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিমলের সঙ্গে হঠাৎ এইভাবে যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে—ভাবতেই পারিনি।

নালা চটিতে এসে পৌঁছলাম রাত আটটায়। চটি নিস্তব্ধ, নিঝুম। চটিওয়ালারা দোকানপাট বন্ধ করছে। তাই অন্য কাজ না করে চটিওয়ালার থেকে আমাদের রেখে যাওয়া জিনিসগুলো ফেরত নিলাম। আর বিমলের জিনিসগুলো অপর একটা ব্যাগে পুরে রেখে দিলাম। ফিরে এসে ও-ওর জিনিস নেবে।

সারাদিনের পর রাত্রেই আমাদের পথ চলার বিরতি ঘটে। সেই সময়ই কেবল আশ্রয় নিই কোন চটিতে কিংবা ধর্মশালায়। আজ রাতের আস্তানা এই নালা চটিতে।

শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি, সাড়ে তিনটে। আবার চলতে হবে পথ। দিনের বেলা ব্যস্ত থাকি পথ চলার কাজে, রাত্রেও শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখি পথের। পথ আর পথ। পথই মনের সব স্থানটুকু অধিকার করে বসে আছে। অন্য কোন চিন্তার ঠাঁই নেই সেখানে। উঠে পড়ি শয্যা ছেড়ে।

মোমবাতি জ্বেলে গুছিয়ে নিই এলোমেলো জিনিসগুলো, তারপর পিঠঝুলি তুলে নিই কাঁধে, নেমে আসি পথে।

চারিদিক. নিস্তব্ধ, নিঝুম। কোথাও একটি জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। বোবা রাত্রির গোঙানো শব্দ, আর বহুদূর থেকে মন্দাকিনীর কল্ কল্ ছল্. ছল্. শব্দের শেষ রেশটুকু ভেসে আসে বাতাসের সঙ্গে। আমরা যখন যাত্রা করি, আকাশ ভর্তি তারাগুলো তখনও জ্বল জ্বল করে জ্বলে মাথার উপর। তাদের আলোর ক্ষীণ রশ্মির স্নিগ্ধ আভাটুকু এসে পড়ছে আশে পাশে। খুবই ক্ষীণ সে আলোর রশ্মি। সে আলোয় পথ আলোকিত হয় না। তাই টর্চের আলো জ্বলে পথ চিনে চলতে হয় আমাদের।

নালা চটির অল্প দূরে বামহাতি পথ। পথটা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের পর পাহাড় টপকে সোজা চলে গিয়েছে বদরিনাথে। পথ উৎরাই প্রভাত হতে আর বেশী দেরী নেই। পূব আকাশ প্রভাতী সূর্যের রক্তিম আভায় রঙীন হয়ে উঠেছে। আমাদের তরুণ মনে লেগেছে তার ছোপ, কণ্ঠে জেগেছে গান—

"রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি
পূর্ব উদয় গিরি ভালে
গাহে বিহঙ্গম পুণ্য সমীরণ—
নবজীবন রস ঢালে।"

গান গাইতে গাইতে এসে পৌঁছে গিয়েছি মন্দাকিনীর তটদেশে। দু'টো পাহাড়কে পৃথক করে দর্পিতা নাগিনীর মত ঢেউ-এর ফনা তুলে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে মন্দাকিনী। মানুষ মন্দাকিনীর গর্বকে করেছে খর্ব। তারই বুকের ওপর বেঁধেছে লৌহসেতু। সেই সেতুর উপর দিয়ে যাত্রীরা নির্বিঘ্নে পারাপার হয়। মন্দাকিনীর অপর পার থেকে পথ চড়াই।

ঘণ্টা আড়াই পথ চলার পর এসে পৌঁছলাম ৪,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত উখীমঠে। উখী মঠের অপর নাম উষা মঠ। বানাসুরের

মেয়ে উষাদেবীর নামানুসারে মঠ ও স্থানের নামকরণ হয়েছে উষা মঠ বা উখীমঠ। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই মঠ। মঠের ভিতর বিরাট প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের একপাশে লাইব্রেরী, বিশ্রাম ঘর, দপ্তরখানা ও প্রার্থনা ঘর। দপ্তর ঘরের পাশেই কেদারনাথের গৃহ। এই গৃহে কেদারনাথের রৌপ্য মূর্তি ও স্বর্ণখচিত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত গদি আছে। শীতকালে যে ছ'মাস কেদারনাথের মন্দির হিমাবৃত থাকে সেই ছ'মাস এইখানেই কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। কেদারনাথের গৃহ সংলগ্ন পার্বতীর গুপ্তগৃহ নামে একটি গৃহ আছে। সেই গৃহে পার্বতী, পঞ্চপাণ্ডব, পঞ্চকন্যা প্রভৃতির মূর্তি আছে। প্রাঙ্গনের প্রায় মাঝখানে ওঁকারেশ্বরের মন্দির। পঞ্চ কেদারের অন্যতম কেদার মধ্যমেশ্বরের 'পারমানেণ্ট হেড্ কোয়ার্টারস্' হলো এই মন্দির।

গ্রীষ্মকালে ডুলি সহযোগে মধ্যমেশ্বরকে নিয়ে যাওয়া হয় উখীমঠ থেকে বারো মাইল দূরে চৌখাম্বা পর্বতের মাথায়। পাঠ বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ স্থানেই তাঁর পূজাদি হয়। চৌখাম্বা পর্বতের পথ খুব দুর্গম। দু'একজন ছাড়া, কেদার-বদরি যাত্রীরা ওপথে যায় না বললেই চলে। ছ'মাস পরই মধ্যমেশ্বরকে চৌখাম্বা পর্বত থেকে আবার ডুলিযোগে ফিরিয়ে আনা হয় এই মঠে। বাকী ছ'মাস এখানেই মধ্যমেশ্বরের পূজা করা হয়।

ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে একটি ঘরে উষা, অনিরুদ্ধ ও অন্যান্য দেবদেবীর কয়েকটি মূর্তি আছে। প্রবাদ, এখানেই নাকি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বানাসুরের মেয়ে উষাকে হরণ করে বিয়ে করেন। পূর্বে এই স্থান বানাসুরের আবাসভূমি ছিল। বর্তমানে দৈত্যদের পরিবর্তে দেবতাদের বাসভূমিতে পরিণত হয়ে তীর্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

উখীমঠকে মানুষের বাসোপযোগী একটা ছোট পার্বত্য শহর বলা চলে। এখানে লোকের বেশ ঘনবসতি আছে। কেদারনাথের পূজারী রাওল সাহেব শীতকালে উখীমঠে বাস করেন।

উখীমঠ দর্শন শেষ করে জলযোগান্তে আবার চলা সুরু হয়। পথিমধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য হলো পঞ্চকেদারের অন্যতম কেদার তুঙ্গনাথ পর্বতের উপর অবস্থিত তুঙ্গনাথ শিবের মন্দির।

গলিয়াবগড় চটির পর থেকে আরম্ভ হয়েছে তুঙ্গনাথ পর্বতের প্রাণঘাতী চড়াই। অনেকে চড়াই করার ভয়ে তুঙ্গনাথকে পাশ কাটিয়ে বরাবর নীচের পথ ধরে চলতে থাকে। ভয়টা হলো মনে। তাই মনটাকে একটু শক্ত করতে পারলেই সব ঠিক। তুঙ্গনাথ পর্বত যত চড়াই হোক আর শরীরে যত কষ্টই হোক, তাঁর কৃপায় একবার যখন এহেন দুর্গম পথের পথিক হয়েছি তখন নিজ চোখে দেখে যাব স্রষ্টা ও তার সৃষ্টিকে। উখীমঠ থেকে তুঙ্গনাথের দূরত্ব তেরো মাইল। পথে যাত্রী চলেছে দলে দলে। সকলের সাথে মিলে মিশে এক হয়ে আমরাও চলেছি। পথে যখন নামি তখন আমরা সবাই যাত্রী। একই পথে চলি। কেউ আগে, কেউ পিছে। লক্ষ্যস্থল সকল যাত্রীরই এক। পৌঁছবেও সবাই একই জায়গায়। কেউ আগে, কেউ পরে এই যা। সারাদিন চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে পথ চলে দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছে। পা যেন আর চলে না।

কোন রকমে দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে এনে ফেললাম গলিয়াবগড় চটির শেষ প্রান্তে। একটু বিশ্রাম না নিলে আর পথ চলা যাবে না। পা ছড়িয়ে, পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে পথের ওপর আমরা দু'জনে বসে পড়লাম। এক পাঞ্জাবী বুড়ি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে এলো, মাথা থেকে পুঁটলিটা নামিয়ে সেও আমাদের পাশে বসলো। সোজা হাত পাতলো আমাদের সামনে। বুড়ির হাতে সাধ্যমত দিলামও কিছু। বুড়ির সঙ্গে আলাপের পর জানতে পারলাম যে সে পথে ভিক্ষা করতে করতে চলেছে বদরিনাথ দর্শনে। সম্বলের মধ্যে তার একটা ছোট্ট পুঁটলি, একটা শতচ্ছিন্ন কম্বল আর হাতে একগাছা সরু লাঠি। কঙ্কালসার দেহ। বুড়ি একটু একটু করে হাঁটে—মাথা থেকে পুঁটলিটা পথের ওপর নামিয়ে রেখে নিজে বসে একটু জিরিয়ে নেয়। যাত্রীর

দেখা পেলে হাত পাতে। ভিখ মাঙ্গে। বদরিনারায়ণজী যেদিন বুড়িকে দয়া করে, সেদিন বুড়ির ভিক্ষা জোটে। তা না হলে দিন তার কাটে অর্ধাহারে অথবা অনাহারে। তবুও বুড়ির যেন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পথে যদি তার মরণও ঘটে—তাতে তার ক্ষতি নেই! বদরিনারায়ণজীর চরণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলেই এ যাত্রায় সে মুক্তি পায়। সংসারে তার আপনজন বলতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সে একা মৃত্যুর জন্যে দিন গুণছে। কিছুটা জিরিয়ে নেওয়ার পর বুড়ি আবার উঠে দাঁড়ায়। পুঁটলিটা তুলে নেয় মাথায়। তারপর শীর্ণ হাতে লাঠির ওপর ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধীরপদক্ষেপে এগোতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর আমরাও উঠে পড়ি।

গলিয়াবগড় চটি থেকে যাত্রা করার সময় এক গাড়োয়ালী আমাদের সঙ্গ নেয়। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছি। চলার গতি আমাদের অনেক কমে গিয়েছে। পিঠের বোঝা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। মনে হয় পথের শেষ হলেই এখন বাঁচি।

কষ্ট করে পথ চলতে দেখে গাড়োয়ালী লোকটি আমাদের দু'জনের পিঠঝুলি কাঁধ থেকে খুলে নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিলো। কাঁধে পিঠঝুলি না থাকায় শরীরটা একটু হাল্কা মনে হলো। পাহাড়ী পথে এমনি চলাই কষ্টকর, তার ওপর পিঠে বোঝা নিয়ে চলা যে সে কি ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার তা বলে সকলকে বোঝানো যায় না। আমরা যদি অল্প অল্প পথ চলতাম, তাহলে কোন কষ্টই গায়ে লাগতো না। কিন্তু পথ চলার সময় সে কথা খেয়াল থাকে কৈ? তখন সারাদিন ধরে মাইলের পর মাইল চড়াই উৎরাই পথে হেঁটে চলি। আমাদের হাঁটার কথা শুনে গাড়োয়ালী লোকটি একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। আশ্চর্য হবারই কথা। কারণ আমরা কলকাতার ছেলে। তার ধারণা কলকাতায় কাউকে একটুও হাঁটতে হয় না। পা বাড়ালেই ট্রাম-বাস-মোটর। কিন্তু এই পার্বত্য প্রদেশে বিরাট বিরাট চড়াই-উৎরাই করা কলকাতা শহরের

ছেলেদের পক্ষে কম কথা নয়! পাহাড়ীরা তো ভাবতেই পারে না যে সমতল ভূমির লোকেরা বিশেষ করে কলকাতার লোকেরা পাহাড়ী পথে কেমন করে হাঁটে?

বুঝিয়ে দিলাম—সমতলবাসীদের পাহাড়ী পথে পাহাড়ীদের মত চলার অভ্যাস নেই ঠিকই, কিন্তু সমতল থেকে লোক যখন হিমালয় আসে, হিমালয়ই তখন তাকে যত্ন করে শিখিয়ে দেয় হিমালয়ের পার্বত্য পথে কি করে চলতে হয়। দু'দিনে সমতলভূমির লোকেরা পাহাড়ীদের মতই পাহাড়ী পথে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন তারাও পাহাড়ী পথে দিনের পর দিন হাঁটতে পারে। এই আমাদের কথাই ধরা যাক। আমরা সত্যি কলকাতা শহরে এক কদম হাঁটি না। কিন্তু হিমালয় পর্যটনে এসে নিজের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে দিন গড়ে তেইশ-চব্বিশ মাইল পথ অনায়াসে হেঁটে যাই।

আমার কথা শুনে গাড়োয়ালী লোকটি বিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে পাহাড়ীদের পক্ষে যা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে কি করে তা সম্ভব হয়! আমাদের কথাবার্তা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, শেঠজী, তোমরা বাহাদুর। তবে কিনা পাহাড়ে চলারও একটা পদ্ধতি আছে। সেটা সমতল ভূমির লোকের চেয়ে বেশী জানে পাহাড়ীরা—পাহাড়ে যাদের জন্ম। পাহাড় চলার সম্বন্ধে পাহাড়ীদের মধ্যে একটা কথার চল আছে। কথাটা হলো এই—

'পাহাড় মে দিনভর কমতি চল না,
শরীর কো লিয়ে জ্যাদা খানা।
মুহুঁ মে রাম নাম বোল না,
গোড় পর খেয়াল রাখনা॥'

তোমার কথা সবই বুঝি। বুঝি পাহাড়ে দিনের পর দিন ক্রমাগত চললে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হিমালয়ের উপল বহুল পথে পা রাখলে নিজেকে আর সংযত করতে পারি না। মেতে যাই

পথের প্রেমে। লক্ষ্য শুধু পথ আর পথ। তখন মনে হয় চলাটাই আনন্দ, চলাটাই অমৃত।

পথে বসে জিরিয়ে বেলা দেড়টার সময় ক্লান্ত দেহে হাজির হলাম পৌথীবাসা চটিতে। বিশ্রামের প্রয়োজন কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ক্ষুধা নিবৃত্তির। তাই আর না এগিয়ে পৌথীবাসাতেই দিবাহারের বন্দোবস্ত করার জন্যে একটা চটিতে এসে উঠলাম। চটিওয়ালার থেকে সওদা আর বাসনপত্র চেয়ে নিয়ে পঞ্চা শুরু করে দিলো রান্না। আমি ওকে রান্নার সব ঠিক ঠিক জোগান দিতে লাগলাম। ফলে পরস্পরের সহযোগীতায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না শেষ হয়ে গেল। রান্নার শেষে পঞ্চা বললো, চল স্নান করে আসি।

সাধু প্রস্তাব। ধূলা মলিন শরীরটাকে জলে চুবিয়ে একটু তাজা করে নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। কথা আর কাজ। রান্নার জিনিস পত্র সব ঢাকাঢুকি দিয়ে গামছা নিয়ে হাজির হলাম কলে। পি-ডব্লু-ডির কল মাত্র একটি। তাতে ভিড়ও কম নয়। বিশেষ করে পাঞ্জাবী যাত্রীদের ভিড়টাই বেশী। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ঠেলাঠেলি, গাদাগাদি হয়ে স্নান করছে। কেউ অর্দ্ধ উলঙ্গ, কেউবা আবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই স্নান করছে, কাপড়ে সাবান ঘসছে। স্ত্রী-পুরুষ এদের কারুরই লজ্জা সরমের বালাই নেই। এই দৃশ্য দেখে মনে হয় এরা বুঝি নাঙ্গা সাধু-সন্ন্যাসীদের মত কাম-ক্রোধ-লোভ, লজ্জা-সরম সব কিছু বর্জন করে এসেছে তীর্থে। ঐ অবস্থার মধ্যে এক বালতি জল নিয়ে দু'জনে কোন রকমে স্নান সেরে নিলাম। শীতল জলে শরীর কিছুটা ঠাণ্ডা হলো। এবার উদর ঠাণ্ডা হলেই হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে তাও হলো। এবার প্রয়োজন একটু বিশ্রামের। খাওয়া দাওয়ার পর কম্বল বিছিয়ে সব মাত্র শুয়েছি এমন সময় কোথা থেকে এক পাঞ্জাবী বয়স্ক মহিলা এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, মেরি লাল, ফোড়ার কোন দাওয়াই আছে?

ফোড়া কার হয়েছে, আপনার?

আমার না। আমার লড়্কীর।

কোথায় আপনার লড়্কী? আর দাওয়াই বা নেবেন কিসে? কথার আর কোন জবাব না দিয়ে মহিলাটি আমাদের চটি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। তখুনি লড়্কীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, এরই বুকে আজ ক'দিন ধরে মস্ত এক ফোড়া উঠেছে। ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে। ফোড়ার যন্ত্রণায় ও আর পথ চলতে পারছে না।

মেয়েটি আমাদেরই সমবয়সী, গোলাপ ফুলের মত গায়ের রঙ। সুন্দর প্রফুল্ল মুখ, টানা চোখ। বেশ সুদর্শনা মেয়ে। দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকার মত রূপ মেয়েটির। কিন্তু এ কদিনে ফোড়ার যন্ত্রণায় বেচারা খুবই মুসড়ে পড়েছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ফোড়া হয়েছে আপনার?

লজ্জাবনত মুখে মেয়েটি বুকের উড়নিটা সরিয়ে দিল। ডানদিকের স্তনের ওপরই একটা দুষ্ট ব্রণ। ভীষণ মূর্তি তার। আর কালবিলম্ব না করে পাশের যাত্রীদের থেকে একটা হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে গরম জল করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফোড়াটাকে 'হটকম্প্রেস' করতে লাগলাম।

হটকম্প্রেসের পর এন্টিব্যাকটি্ন আর তুলো দিয়ে ফোড়াটাকে বেঁধে দিলাম। চলে যাবার সময় মেয়েটির হাতে কিছু তুলো আর এন্টিব্যাক-ট্রিনের শিশিটা দিয়ে বললাম, দিনে অন্ততঃপক্ষে বার দুই তুলো দিয়ে গরম সেক করে এই শিশির দাওয়াইটা লাগাবেন। শীগগীর আপনার ফোড়া ভাল হয়ে যাবে। মেয়েটি আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার করে তার মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

বেলা তিনটের সময় পৌথীবাসা চটি থেকে রওনা হয়ে দোগলভীটা পেরিয়ে পাকদণ্ডী পথে বেনিয়াকুণ্ড নামক স্থানে এসে পৌছালাম। বেনিয়াকুণ্ড বেশ সমতল জায়গা। এখানে কয়েকটি চটি ও কালীকম্বলীর ধর্মশালা আছে। আমাদের সঙ্গে আগত সব যাত্রীই রাত্রিবাসের জন্যে বেনিয়াকুণ্ডে রয়ে গেল। এখানের চটি ও ধর্মশালা আগে থাকতেই

যাত্রীতে ভরে আছে। আমরা বেনিয়াকুণ্ডে না থেকে চোপতা চটির দিকে এগিয়ে গেলাম। চোপতা তুঙ্গনাথ পর্বতের ঠিক নীচেই। এখানে যাত্রীর তেমন ভিড় নেই। চটিগুলো সব ফাঁকা। চোপতায় ঠাণ্ডাও ভীষণ। বোধহয় সেই কারণে যাত্রীরা রাত্রের আশ্রয় নেয় বেনিয়াকুণ্ডে।

চোপতা থেকে পথ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটি পথ গিয়েছে দু'মাইল উপরে তুঙ্গনাথে ও অপর পথটি তুঙ্গনাথ পর্বতের নীচ দিয়ে এক মাইল দূরে ভুলকোনা চটিতে গিয়ে মিলেছে। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথের পথ কঠিন চড়াই। কেদারনাথ থেকে যেসব যাত্রী হাঁটাপথে বদরিনাথ যায়, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ যাত্রী তুঙ্গনাথ পর্বতে চড়াই ঠেলে তুঙ্গনাথ দর্শনে যায় না। কারণ অনবরত চড়াই-উৎরাই করার পর তুঙ্গনাথ দর্শনের আকর্ষণ যাত্রীদের কাছে শিথিল হয়ে পড়ে। তাদের লক্ষ্য শুধু কোন রকমে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো।

চটিতে জিনিসপত্র রেখে পোষাক পরিচ্ছদ পাল্টে এসে বসলাম চটির সামনে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরই কেবল পাহাড় আর পাহাড়। সেইসব পাহাড়ের গা বেয়ে চারিদিক থেকে ছোট বড় ঝরনার স্রোতধারা,

"শিলা হ'তে শিলান্তরে
লুটিয়ে লুটিয়ে—"

বিরাট বিরাট উপলখণ্ডের পর উপলখণ্ড পেরিয়ে পাহাড়ের তলদেশে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আবার কোন কোন ঝরণার জলধারা পাহাড়ের গায়ে জমাট বেঁধে বরফ হয়ে জমে আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কে যেন রূপোর চাদর দিয়ে যত্ন করে ঐ জায়গাটুকু মুড়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যা হতেই চটিতে উঠে এসে চটিওয়ালাকে রাত্রের আহারের বন্দোবস্ত করতে বলে দু'জনে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত আটটার সময় চটিওয়ালা আমাদের ঘুম থেকে তুলে গরম পুরী খাইয়ে













গেল। ঘুমের ঘোরে শুয়ে শুয়েই চটিওয়ালার তৈরী পুরী খেয়ে মুখ মুছে আবার পাশ ফিরে শুলাম।

সারাদিন পথ চলায় যাত্রীদের দেহমনে যে ক্লান্তি আসে, সে ক্লান্তির ঘোর রাতে একটা গাঢ় নিদ্রার পর কেটে যায়, রাত প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের দেহমনে আবার জেগে ওঠে নতুন শক্তি, পথ চলার নতুন উদ্যম।

ভোর সাড়ে তিনটার সময় থেকে উঠে তুঙ্গনাথ যাবার জন্যে পঞ্চাকে ডাকছি। পঞ্চা তখনো ঘুমে অচেতন। বুঝলাম ক্লান্তির ঘোর এখনো ওর কাটেনি। পথের আহ্বানে তবু ডাকতে হয় সঙ্গীকে। অনেক ডাকাডাকির পর সঙ্গীর কণ্ঠ থেকে এলো একটি করুণ জবাব, ভাই, সর্বাঙ্গে বড় ব্যথা। তুঙ্গনাথ পাহাড়ে চড়াই ভেঙে উঠতে পারব না। আর যদি এই অবস্থায় চড়াই ভেঙে তুঙ্গনাথ যাই, তাহলে বদরিনারায়ণ যাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটবে না। তুঙ্গনাথ তুই একলাই যা। আমি বরং একটু বেলা হলে তুঙ্গনাথের নীচের পথ দিয়ে ধীরে সুস্থে আগের চটিতে গিয়ে তোর জন্যে অপেক্ষা করব।

অনেক বলা সত্ত্বেও পঞ্চা তুঙ্গনাথ যেতে রাজী হলোনা। বাধ্য হয়ে আমাকে একলাই বেরিয়ে পড়তে হলো পথে। চারিদিক গাঢ় অন্ধকার। দূরে আকাশের তারাগুলো সব জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলছে। দেওদার গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের তারাদের রোশনাই ঠিকরে পড়ছে পথে। সে রোশনাই এতই ক্ষীণ যে তাতে পথ দেখা যায় না। তখন সাহায্য নিতে হয় টর্চের। টর্চের আলোয় পথ দেখে লাঠির ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে চলেছি তুঙ্গনাথ পাহাড়ে। পথে লোকমুখে শুনেছি যে তুঙ্গনাথের দু'মাইল চড়াই, ত্রিযুগীনারায়ণের তিন মাইল চড়াই অপেক্ষা আরো কঠিন। পথ যতই চড়াই হোক না কেন সে বিষয়ে চিন্তা করিনা। চিন্তা শুধু বন্ধু বিমল আর পঞ্চাকে নিয়ে। এরাই আমার চিন্তার জট।

পিছনে, ফাটা চটিতে পায়ের ব্যথার জন্যে রয়ে গেল বিমল আর তুঙ্গনাথের ফুট হিলস্ চোপতায় একই কারণে পঙ্কাও রয়ে গেল। আজ আমি তুঙ্গনাথের পথে সঙ্গীহীন একক যাত্রী। তুঙ্গনাথ পাহাড়ে পৌঁছে দর্শন করব বাবা তুঙ্গনাথের শ্রীচরণ। মুহূর্তে সব চিন্তা ভুলে ঐ একটি চিন্তার আনন্দে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরে উঠলো। এ আনন্দ বড়ই মধুর।

তুঙ্গনাথ পাহাড়ের পথ অপ্রশস্ত ও বন্ধুর। পথের দু'ধারে জঙ্গল। টর্চের বোতাম টিপে সেই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পা পা করে উঠতে থাকি উপরের দিকে। জানি পথ এক, তবুও অচেনা-অজানা। সামান্য কিছুটা পথ আসার পর হঠাৎ এক অহেতুক ভীতি আমার মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসলো। সেইস্থানের উপলখণ্ডের উপর থেকে আর একটি পাও উঠল না। ভয়ার্ত চিত্তে বসে পড়লাম পথের উপরে। মনের ভীতি কাটাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম, জয় তুঙ্গনাথ, জয় তুঙ্গনাথ। সে হুঙ্কার ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এসে আমারই কানে বাজে, মনের ভীতি কাটে না। তার উপর হিমেল বাতাসের কামড় অসহ্য হয়ে ওঠে। না পারি নেমে আসতে, না পারি উপরে উঠে যেতে। নিরুপায় হয়ে বসে বসে স্মরণ করতে থাকি তুঙ্গনাথকে। এইভাবে কাটে কিছুক্ষণ। হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখি, এক জটাজুট কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী আমার কিছুটা সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিজন পথে সন্ন্যাসীকে দেখে মনে সাহস এলো, উঠে দাঁড়ালাম। যাক আর ভয় নেই। এই নির্জন পথে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। সে সাধু-সন্ন্যাসী হোক আর যেই হোক মানুষতো বটে। মনে মনে ঠিক করে ফেলি সন্ন্যাসী আর আমি বাকি পথটুকু একসঙ্গেই শেষ করব। তাই সন্ন্যাসী কে ধরবার জন্যে খুব দ্রুত পা চালালাম পথের দিকে।

তুঙ্গনাথের চড়াই-এর কথা আর খেয়াল নেই, হিমেল বাতাসের কামড় আর অসহ্য মনে হল না। এই ঠাণ্ডার রাজ্যে কপালে দেখা দিল স্বেদ বিন্দু। সন্ন্যাসীর সাথে একসঙ্গে পাশাপাশি চলার

জন্যে যত তাড়াতাড়িই পথ চলি না কেন সন্ন্যাসী ও আমার মধ্যে কিছু ব্যবধান থেকে যায়। সন্ন্যাসীর পাশাপাশি চলা আর হয় না।

ইতিমধ্যে আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গিয়েছে। পথে যাত্রী চলাচল সুরু হয়নি তখনো। সন্ন্যাসীর পিছনে ছুটে এসেছি দেড় মাইল চড়াই পথ। পথের একটা বাঁক ঘুরতেই চোখের সামনে ছবির মত ফুটে উঠলো তুঙ্গনাথজীর বিশাল মন্দির। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখে নিই তুঙ্গনাথজীর মন্দির। করজোড়ে ভক্তি ভরে তুঙ্গনাথজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। চীৎকার করে বলে উঠি, জয় বাবা তুঙ্গনাথজীর জয়! এ ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে না। এ ধ্বনি বাবা তুঙ্গনাথের কাছে গিয়ে জানায় ভক্তের আকুতির কথা।

.বাঁক ঘোরার পর আর দেখতে পেলাম না জটাজুট কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীকে। মনে ভাবলাম তিনি এতক্ষণে তুঙ্গনাথজীর মন্দির পৌছে গিয়েছেন। মন্দিরে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখা হবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে। অনেকখানি পথ একটানা হেঁটে এসেছি। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। তুঙ্গনাথের প্রবেশ পথের প্রথমেই পড়ে আকাশগঙ্গা। এই আকাশগঙ্গার ধারেই একটা পাথরের উপর পিঠঝুলিটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বসে পড়ি। আকাশ একেবারে ফর্সা। চারিদিকে ফুটে উঠেছে প্রভাতী সূর্যের রোশনাই। নতুন যাত্রী দেখে একজন পাণ্ডা আমার কাছে এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল আমার নাম, ধাম ইত্যাদি।

পাণ্ডাজীকে আমার জিজ্ঞাস্য তেমন কিছু ছিল না।

কৌতূহলবশতঃ তবু জিজ্ঞাসা করি, পাণ্ডাজী আমার আগে আজ কতজন নতুন যাত্রী এসেছে তুঙ্গনাথে ?

আমার কথা শুনে পাণ্ডাঠাকুর তো অবাক! ঘাড় নেড়ে বললেন, না আপনি ছাড়া আজ এখনো তুঙ্গনাথে কোন যাত্রী আসেনি। আর কেউ এলে সে তো আমাদের চোখেই আগে পড়বে।

মনে মনে ভাবলাম, তা ঠিকই। তীর্থে পাণ্ডারা শিকারী, আর যাত্রীরা হলো তাদের শিকার। এখানে পাণ্ডাদের শ্যেনদৃষ্টির হাত থেকে কারুরই রেহাই পাওয়ার জো নেই। একথা সত্যি হলেও, পাণ্ডাঠাকুরকে বললাম, আমি যে নিজ চোখে একজন সন্ন্যাসী যাত্রীকে তুঙ্গনাথে আমার আগে-ভাগে আসতে দেখেছি পাণ্ডাঠাকুর। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি!

পাণ্ডাঠাকুর দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন, না, কোন সাধু-সন্ন্যাসী আজ এখনো এসে তুঙ্গনাথে পৌঁছায়নি। নতুন যাত্রী বলতে, আপনিই আজ প্রথম। তাছাড়া, এই হিমরাজ্যে এত ভোরে কোন যাত্রী আজ পর্যন্ত এসেছে বলে আমার মনে পড়ে না।

পাণ্ডাঠাকুরের কথাবার্তা শুনে ব্যাপারটা আমার কাছে একটু রহস্যের মত মনে হতে লাগলো। সন্ন্যাসী তবে কে? আমি কি ভুল দেখলাম? মনে মনে ভাবতে লাগলাম পথে আসার দৃশ্যটা। একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময়—

পাণ্ডাজী বললেন, মহারাজ, মন্দিরে চলুন। সেখানে গিয়ে আজ আপনিই সর্বপ্রথম তুঙ্গনাথজীর শ্রীচরণ পূজা করবেন।

নিশ্চয়ই যাব পাণ্ডাজী, নিশ্চয়ই যাব।

আকাশগঙ্গার পীযূষ ধারা এসে পড়ছে চৌবাচ্চার মত একটা ছোট জায়গায়। এই চৌবাচ্চাটির নাম অমৃতকুণ্ড। পাণ্ডাঠাকুরের মুখে শুনলাম, এই অমৃতকুণ্ডে স্নান করলে মানুষের পাপ তাপ সব ধুয়ে মুছে বিলকুল সাফ হয়ে যায়। এই আকাশগঙ্গার পীযূষ ধারা তুঙ্গনাথের ওপর চন্দ্রশেখর পর্বত থেকে প্রবাহিত। অমৃতকুণ্ডের জল কনকনে ঠাণ্ডা। অত ভোরে বরফগলা জলে স্নান করতে আমার আদৌ ইচ্ছা হচ্ছিল না। পাণ্ডাঠাকুর আমার ভাবগতিক দেখে বললেন, মুখ হাত ধুয়ে, জল মাথায় স্পর্শ করুন, তাতেও স্নানের ফল হবে।

পাণ্ডা ঠাকুরের যুক্তি মন্দ নয়। অমৃতকুণ্ডের জলে মুখ হাত ধুচ্ছি

এমন সময় হু'জন পাঞ্জাবী তন্বী স্নানের জন্যে অমৃতকুণ্ডে এসে হাজির হলো। ওরা রাত্রে আশ্রয় নিয়েছিল তুঙ্গনাথ পর্বতের একটা চটিতে। আমাকে দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে কি জানি বলাবলি করলো, তারপর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নেমে পড়লো আকাশগঙ্গার বরফগলা জলে। অত ভোরে সদ্য তুষার গলা জলে ওদের নগ্ন হয়ে স্নান করতে দেখে আমারই যেন কষ্ট হতে লাগলো। এদেরই বলে 'বোনাফাইড' তীর্থযাত্রী।

পাণ্ডা ঠাকুর আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তার ডেরায়। হাত-পা সেঁকে গরম করার জন্যে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বেলে দিলেন, আরাম করে বসার জন্যে পেতে দিলেন একটা পুরু কম্বল।

এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর। হিমালয়ের কোলে প্রায় তেরো হাজার ফিট উচ্চে নির্জন পরিবেশের মধ্যে তুঙ্গনাথের মন্দির। স্থানটি নির্জন হলেও, নির্জনতার মধ্যে রয়েছে অতুল সৌন্দর্য। 'সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে ভরি দিল তব শূন্যতা।'

আগুনে হাত-পা সেঁকার পর পাণ্ডাঠাকুর আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তুঙ্গনাথের মন্দিরে। হাতে আছে দেবপূজার উপচার, এই দিয়ে হবে তুঙ্গনাথ মহাদেবের পূজা। যদিও আমি তীর্থযাত্রী হিসাবে আসিনি, এসেছি হিমালয় ভ্রমণে। তীর্থযাত্রাটা আমার গৌণ, হিমালয় দর্শনই হলো মুখ্য; তবুও গিয়েছি হিমালয়স্থিত দেবতার মন্দিরে মন্দিরে। অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে হিমতীর্থের প্রতিটি দেবতার পূজা দিয়েছি। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশকরে হু'চোখ মেলে দেখেছি দেবতার শ্রীমূর্তি, মন্দিরের বাইরে দেখেছি শুভ্র জটাজুট সমন্বিত ধ্যানমগ্নযোগী দেবতাত্মা হিমালয়কে। এদেখা হলো জীবনের সার্থক দেখা। হিমালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তীর্থ। হিমালয়ের হুর্বার আকর্ষণে যোগী-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, রাজা-রাজপুত্র, কবি, দার্শনিক, ভাবুক, পর্যটক সামান্যতম গৃহী পর্যন্ত মায়া-মমতা ভরা গৃহ পিছনে ফেলে ছুটে যায়।

'শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশাংকুর।'

তুঙ্গনাথ মন্দিরের চারিদিকে বিরাট চত্বর। মন্দিরের বাইরে যে সব দেবদেবী অবস্থিত, পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সবশেষে পাণ্ডাঠাকুর তুঙ্গনাথ মন্দিরের রুদ্ধ কপাট উন্মুক্ত করলেন। মন্দিরের দ্বার খুবই ছোট। এই ছোট দ্বারই মন্দিরের একমাত্র প্রবেশ ও নির্গমনের পথ। মন্দিরের প্রবেশপথে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করে ছোট দ্বার দিয়ে আমি আর পাণ্ডাঠাকুর তুঙ্গনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

মন্দিরের ভিতর খুবই অন্ধকার। ঐ ছোট একটিমাত্র পথ দিয়ে খুব সামান্যই আলো-বাতাস আসে। তাছাড়া মন্দিরে আলো-বাতাস আসার আর ভিন্ন পথ নেই। মন্দির জনমানব শূন্য। এত ভোরে কোন যাত্রী বাইরে বার হয় না, একটু বেলায় যাত্রীরা এক এক করে মন্দিরে আসতে থাকে। তাতে যে ভিড় হয়, তাও খুবই সামান্য। কেদারনাথ মন্দিরের তুলনায় তুঙ্গনাথ মন্দিরের যাত্রীর ভিড়, ভিড়ই নয়। কেদারনাথ দর্শনের পর যাত্রীরা তুঙ্গনাথ দর্শনে আসে খুব কম। বেশীর ভাগ যাত্রীই কেদার-বদরিনাথ দর্শন করে ভালোয়-ভালোয় ফিরতে পারলেই বাঁচে। পথে ত্রিযুগীনারায়ণ আর তুঙ্গনাথ শিব তাদের ভাগ্যে দর্শন হয় না। তুঙ্গনাথ শিবের সামনে হাজির হয়ে প্রথমেই নতজানু হয়ে দেবাদিদেব তুঙ্গনাথ মহাদেবের রাতুল চরণে আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলাম। পাণ্ডা ঠাকুর শিব পূজার মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার অন্তরাত্মা পরমাত্মার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো। পূজার তন্ত্রমন্ত্র সব ভুলে কণ্ঠে তখন শুধু ধ্বনিত হতে লাগলো—ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়।

পূজান্তে পাণ্ডা ঠাকুর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে উত্তমরূপে দর্শন করালেন পঞ্চমুখ বিশিষ্ট তুঙ্গনাথ শিবকে। তুঙ্গনাথ হলেন পঞ্চকেদারের অন্যতম তৃতীয় কেদার। তুঙ্গনাথ শিবের চরণামৃত পান করে ভক্তিপূর্ণ অন্তর নিয়ে মন্দিরের বাইরে আসি। এবার মন্দির প্রদক্ষিণের পালা। প্রদক্ষিণ পথে পাণ্ডা ঠাকুর অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির এবং পিতৃশিলা, কুর্মশিলা, গরুড়শিলা, নরশিলা ও স্বর্গশিলা প্রভৃতি পঞ্চশিলা দর্শন করিয়ে শেষে নিয়ে এসে বসালেন স্বর্গশিলায়। এই শিলার উপর বসিয়ে তুঙ্গনাথের পাণ্ডারা যাত্রীদের সুফল করান। সুফল হলো তীর্থ দর্শনের ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত তীর্থপাণ্ডার আশীর্বাদ। পাণ্ডারা বলেন, সুফল না হলে তীর্থ দর্শনের কোন ফলই হয় না। তাই ধর্মার্থী পুণ্যাভিলাষী যাত্রীর দল তীর্থ দর্শন করে নিজ নিজ পাণ্ডাকে দিয়ে সুফল করান।

স্বর্গশিলায় বসে আমিও আমার পাণ্ডাকে দিয়ে সুফল করালাম। সুফলান্তে পাণ্ডা ঠাকুরকে যৎসামান্য প্রণামী দিয়ে সামান্য জলযোগ করে পাণ্ডার দেওয়া সুফল মস্তকে নিয়ে তুঙ্গনাথের জয়ধ্বনি দিতে দিতে ভিন্ন পথে নামা সুরু করি।

পাহাড়ের উপর ওঠা অপেক্ষা পাহাড় থেকে অবতরণ করা আরো বেশী কষ্টকর ও বিপজ্জনক। পাহাড়ে চড়াই করার সময় নিজেকে বশে রাখা যায়। কিন্তু অবতরণের সময় নিজের পায়ের ওপর আর কোনই জোর থাকে না। তখন কেবল সামাল সামাল। এইরূপ অবস্থায় নিজেকে সামলাতে না পারলে একেবারে পপাত ধরণীতল। যা হোক, নিজেকে কোন রকমে সামলে সুমলে দু'মাইল অপ্রশস্ত কঙ্করময় উৎরাই পথ বেয়ে তুঙ্গনাথ থেকে নেমে এলাম ভুলকোনা চটিতে।

পঞ্চার এই চটিতে আমার জন্যে অপেক্ষা করার কথা। কিন্তু পঞ্চাকে চটির ত্রিসীমানায় দেখতে না পেয়ে মনটা একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো। তবে কি ও চোপতা চটি থেকে রওনা হয়নি? ওর শরীর কেমন আছে তাই বা কে জানে? অসহায় অবস্থায় পঞ্চাকে

পিছনে ফেলে এগোনো ঠিক হবে না। সাত পাঁচ ভাবার পর চোপতা চটিতে ফিরে যাওয়া ঠিক করলাম। পিছনে হাঁটার আগে ভুলকোনা চটির চারিদিক শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে দেখে নিই, যদি ওর কোন সন্ধান মেলে। এমন সময় পথের ধারে একটা পাথরের গায়ে আঁকা এক সাংকেতিক চিহ্ন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এই সাংকেতিক চিহ্নর অর্থ, অন্য যাত্রীরা বোঝে না, বুঝি শুধু আমরা। পাথরটার কাছে গিয়ে সাংকেতিক চিহ্নটা ভালো করে নিরীক্ষণ করার জন্যে দৃষ্টি মেলে তাকাতেই নিথর পাথরের গায়ে আঁকা বোবা চিহ্নটা মুখর হয়ে বলে উঠলো, এগিয়ে যাও, তোমার সাথী এই পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে সামনের দিকে।

পিছনে হাঁটার চিন্তা ভুলে এগিয়ে যাই সামনের দিকে। পথে যাত্রীরা সারি বেঁধে চলেছে কেউ আগে, কেউ পিছে। মাঝে মাঝে পিছন থেকে সওয়ারী নিয়ে ছুটে আসে, কাণ্ডি, ডাণ্ডি, আর ঘোড়াওয়ালারা। 'হৈ! বাঁচ! বাঁচ!' চীৎকার করে পদব্রজাদের জানিয়ে দেয় তাদের আগমনবার্তা। ওদের গগনভেদী চীৎকারে যাত্রীরা সতর্কিত হয়ে ওঠে। পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। পথ না ছাড়লে, ওদের ধাক্কায় বিপদ অনিবার্য। কাণ্ডি, ডাণ্ডি আর ঘোড়াওয়ালারা সওয়ারী নিয়ে চলে যাওয়ার পর যাত্রীরা আবার ধীর স্থির পদক্ষেপে হাঁটা সুরু করে। হিমালয়ের পথে হাঁটার যেমন তকলিফ আছে, তার চেয়েও বেশী আছে আনন্দ। সেই আনন্দের সব রসটুকু উপভোগ করে একমাত্র হাঁটা পথের যাত্রীরা।

ভালোও লাগে হাঁটা পথের যাত্রীদের সঙ্গে মিলে মিশে পথ চলতে। সহযাত্রীদের মুখে শোনা যায় যে পদব্রজে তীর্থ পরিক্রমা না করলে তীর্থের ফল বাকি থেকে যায়। পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীদের পুণ্যার্জনের ক্ষুধাটা খুব প্রবল। তীর্থযাত্রীরা তীর্থের ষোল আনা ফলপ্রাপ্তির আশা করে। কিন্তু তীর্থ পরিক্রমার যে ফলপ্রাপ্তি—তা তপশ্চর্যা ছাড়া সম্ভব নয়। পথ চলাই হলো তীর্থযাত্রীদের তপস্যা, আর সেই চলাটাই হলো তার অমৃত ফল। অতএব যানবাহন ছেড়ে পায়ে হেঁটে কষ্ট করে

যেতে হবে হিমাঞ্চলের তীর্থ থেকে তীর্থে। তবেই তো হবে সার্থক তীর্থ পরিক্রমা।

আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল হলো চামোলী। চোপতাচটি থেকে তুঙ্গনাথ হয়ে চামোলীর দূরত্ব হবে সোয়া উনিশ মাইল। ভুলকোনা চটির আড়াই মাইল পর পাঙ্গরবাসা চটি। এখান থেকে পথ উৎরাই ও জঙ্গলময়। বড় বড় গাছের জন্যে এই জঙ্গলে সূর্যের আলো প্রায় প্রবেশ করে না বললেই চলে। মাঝে মাঝে গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যদেব উঁকি ঝুঁকি দেয় মাত্র। ঘন বিন্যস্ত গাছের মাথাগুলো আকাশের দিকে সোজা উঠে গেছে। পথের দু'ধারে গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো মাথা ছুঁয়ে যায় যাত্রীদের। জঙ্গলের পথ নির্জন, নিঝুম। জঙ্গলাকীর্ণ পথের শেষে মণ্ডলচটি। মণ্ডলচটিতে পৌঁছেই দেখা হলো পঞ্চা আর বিমলের সঙ্গে।

পঞ্চাকে বললাম, তোকে যে ভুলকোনা চটিতে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, তুই তা না করে এতটা পথ এগিয়ে এসেছিস যে? আর বিমলকেই বা পেলি কোথায়?

পঞ্চা জবাব দিল, চোপতা থেকে রওনা হব হব করছি এমন সময় দেখি বিমল এসে পৌঁছলো চোপতা চটিতে। তখন থেকেই দু'জনে আবার একসঙ্গে পথ চলছি। ভুলকোনাতে আমি তোর কথামত অপেক্ষা করতাম ঠিকই। কিন্তু ভুলকোনা চটিতে রান্না খাওয়ার অসুবিধে প্রচুর। তাই দু'জনে পরামর্শ করে এগিয়ে এলাম মণ্ডলচটিতে।

তোরা তো দেখছি দিব্যি খাওয়া-দাওয়া ক'রে আরাম করছিস্। আমার খাবার কৈ?

তোর অপেক্ষায় বসে বসে এই মাত্র খাবারগুলো দিয়ে দিলাম এক ভিক্ষুক যাত্রীকে। উত্তর দিল বিমল।

ওদের কথা শুনে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। ওদের সঙ্গে আর কোন কথা না বলে চটির দোকানগুলোতে খাবারের সন্ধান করি।

কিন্তু সব দোকানদার চুল্লী নিভিয়ে বসে বিশ্রাম করছে। কোন দোকানদারই আমার সামান্য খাবার তৈরী করে দেওয়ার জন্যে নতুন করে চুল্লী জ্বালতে রাজি নয়। বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষুধাতে সমস্ত শরীরটা ঝিম ঝিম করছে। আর এক পা চলতেও ইচ্ছা করছিল না। পকেটে হাত দিয়ে দেখি মিছরির একটি ছোট টুকরা মাত্র অবশিষ্ট। সেই টুকরাটি গালে ফেলে আকণ্ঠ জল পান করলাম। এছাড়া ক্ষুন্নিবৃত্তির আর কোন উপায় ছিল না। মণ্ডলচটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলি। সারাদিন পথ চলে চলে পথ চলার গতিটাও কমে এসেছে। গন্তব্যস্থলে না পৌঁছনো পর্যন্ত মাঝপথে থেমে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। মন্দগতিতেও চলতে হবে পথ। বেলা পাঁচটার সময় আমরা গোপেশ্বর চটিতে এসে পৌঁছলাম।

গোপেশ্বরের প্রধান দ্রষ্টব্য হলো গোপেশ্বর মন্দির। মন্দিরটি বিশাল ও প্রাচীন। মন্দিরের মধ্যে গোপেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ মূর্তি বিরাজিত। মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গনের একদিকে একটি নাতিউচ্চ বেদীর উপর অষ্ট ধাতুর নির্মিত বিরাট এক ত্রিশূল প্রোথিত রয়েছে। ঐ ত্রিশূলের সঙ্গে সংযোজিত আছে একটি কুঠার। কিংবদন্তী, ঐ ত্রিশূলটি মহাদেবের এবং কুঠারটি মাতৃহত্যাকারী পরশুরামের। ত্রিশূলটির চেহারা দেখে মনে হয় বহু প্রাচীন। ত্রিশূলটির গায়ে দ্বাদশ শতাব্দীর মহারাজা অনেকমল্লের বিজয়বার্তা খোদিত আছে। মন্দিরের পাশেই বৈতরণীকুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করে গোপেশ্বর মহাদেবের পূজা করা বিধি। যাত্রীরা অনেকে বৈতরণীকুণ্ডে স্নান ও তর্পন করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন শেষ হয়ে গেল।

গোপেশ্বর থেকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যস্থল চামোলী শহরে। এপারে পায়ে হাঁটা পথ, ওপারে চামোলী শহর, মধ্যখানে অলকানন্দা।

চামোলীর পুরানো নাম লালসাঙ্গা। গ্রামের লোকেরা এখনো চামোলীকে লালসাঙ্গা বলে থাকে। লালসাঙ্গা কথার অর্থ হলো লাল

পুল। অলকানন্দার উপর যে পুলটি আছে পূর্বে সমস্ত পুলটাতেই লাল রং করা ছিল। তাই লোকে পুলটিকে বলতো লালসাঙ্গা। লালসাঙ্গা থাকাতে জায়গাটিরও নামকরণ হয়েছিল লালসাঙ্গা। বর্তমানে অলকানন্দার উপর সাঙ্গা অর্থাৎ পুলটি ঠিকই আছে, নেই শুধু পুলের গায়ের লাল রং। জায়গার নামও পাল্টেছে। ছিল লালসাঙ্গা হয়েছে চামোলী। চামোলী দোকান, বাজার, ধর্মাশালা, চটি, হোটেল, সাব-ডিভিশ্যানল আদালত, বন বিভাগের দপ্তর, শাসন বিভাগ, খাজাঞ্চিখানা, কুলী এজেন্সী, হাঁসপাতাল, ডাক ও তারঘর ইত্যাদি পরিবেষ্টিত জন-কোলাহল মুখরিত একটি বেশ ছোট সুন্দর সাজানো পার্বত্য শহর। শুধু তাই নয়, চামোলী কেদার-বদরি পথের সংযোগস্থল, বাসের আড্ডা। বাস এখান থেকে উপরের দিকে পিপুলকুঠি এবং নীচের দিকে রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রাজধানী পৌড়ী হয়ে কোটদ্বার রেলস্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করে। বদরিনারায়ণের পথে যোশীমঠ পর্যন্ত বাসের নতুন পথ তৈরী হচ্ছে। বছর কয়েকের মধ্যে বাস যোশীমঠ পর্যন্ত যাতায়াত করবে। বাস পথের যতদূর এগিয়ে যাবে, যাত্রীর সংখ্যা তত বেশী পরিমাণে বেড়ে যাবে ঠিকই। কিন্তু বাস এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে পথের মাহাত্ম্যও যাবে কমে। এখানে এসে সেই রাতের মত আমরা উঠলাম গ্রীণ হোটেলে। বাস স্ট্যাণ্ডের উপরেই এই হোটেল। হোটেলটি ছোট ও দ্বিতল।

চামোলী থেকে বদরিনাথের দূরত্ব হলো আটচল্লিশ মাইল আর পিপুলকুঠি ন'মাইল। বদরিনাথ দর্শনার্থী কেদারনাথের হাঁটা পথের যাত্রীরা প্রায় সকলেই চামোলীতে পৌঁছে পিপুলকুঠি পর্যন্ত ন'মাইল পথ বাসে করেই যায়।

প্রতিদিনের অভ্যাস মত সেদিনও খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকালে হাঁটার তাগাদা নেই। তাই খানিকটা অলসভাবে শয্যায় তিনজনেই শুয়ে রইলাম। বেলা আটটায় হোটেলে সামান্য কিছু জল-যোগ করে পিপুলকুঠিগামী বাসে এসে বসলাম। চামোলী থেকে

পিপুলকুঠির বাসের ভাড়া শ্রেণী ভেদে—একটাকা তিন আনা ও চৌদ্দ আনা।

আধঘণ্টা পর যাত্রী বোঝাই বাস এক এক করে চামোলী শহরকে পিছনে ফেলে অলকানন্দার তীর ধরে আঁকাবাঁকা পিচ ঢালা পার্বত্য পথে ছুটে চললো পেপুলকুঠির দিকে। কেদারনাথের পথে নিত্য সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীকে আর এদিকে বদরীনাথের পথে নতুন সঙ্গী হিসাবে পেলাম কল্লোলিনী অলকানন্দাকে। অলকানন্দার তীরেই হলো বদরিনাথের যাওয়া আসার পথ।

একঘণ্টার মধ্যে বাস এসে পৌঁছে গেল পিপুলকুঠিতে। পিপুলকুঠি ছোট নতুন পার্বত্য শহর। এখানে বাজার, ধর্মশালা, চটি, ডাকবাংলা ও কুলী এজেন্সী ইত্যাদি সবই আছে। অলকানন্দার ওপর পারের হাঁটাপথ এখানে এসে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে বদরিনাথের প্রকৃত হাঁটা পথ পিপুলকুঠি থেকে আরম্ভ আর পিপুলকুঠিতেই শেষ।

নিজেদের সুবিধের জন্যে বাস থেকে নেমে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই একটা চটিতে এসে উঠলাম। এবার যাত্রা বদরিনাথের পথে। তাই সঙ্গের আরো কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস একটা থলিতে পুরে এখানকার চটিওয়ালার জিম্মায় ছেড়ে দিলাম। সকালের খাওয়ার পর্ব পিপুলকুঠি চটিতে সমাধা করে বেলা দশটায় বদরিনাথজীকে স্মরণ করে নেমে পড়লাম পথে।

এই সেই পথ—যে পথে যুগ যুগ ধরে কত মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্মার্থী পুণ্যাত্মা, তীর্থ যাত্রীর দল যাওয়া আসা করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাঁদের বিগত দিনের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে পথের বুকে। আজও এ পথের বুকে কান পাতলে, পূর্ববর্তী মহাত্মাদের পদধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়।

পিপুলকুঠি থেকে রওনা হয়ে একঘণ্টা চলার পর চার মাইল দূরে অবস্থিত গরুড়গঙ্গা নামক এক মনোরম চটিতে এসে পৌঁছলাম। গরুড়গঙ্গা অবধি পথ বেশ চওড়া ও সমতল। এই পথটুকু চলতে

যাত্রীদের কোন অসুবিধে হয় না। এখানে পর্বতের উপর থেকে গরুড়গঙ্গা এসে কল্লোলিনী অলকানন্দার সঙ্গে মিলেছে। গরুড়গঙ্গার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে গরুড়প্রয়াগ বা গরুড়গঙ্গা চটি। কথিত আছে যে, পক্ষিরাজ গরুড় ভগবান বিষ্ণুর বাহন হওয়ার জন্যে এখানে নির্জন পর্বতে বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ভক্তের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু গরুড়কেই বাহন করেন। এদিকে তপস্যায় গরুড়কে সিদ্ধিলাভ করতে দেখে পর্বত সেই সময় গরুড়কে বললে, পক্ষিরাজ, তুমি তো আমার বুকের উপর বসে তপস্যায় দিব্যি সিদ্ধিলাভ করলে, তাতে আমার কি গুণ হলো ?

তার উত্তরে গরুড় পর্বতকে বললে, আমার নামে এই গঙ্গা হলো আর এই গঙ্গার জলে তোমার যে পাথর পড়বে, সেই পাথরে সর্পভয় দূরীভূত হবে।

তাই বোধ হয় হিমতীর্থ বদরিনাথের যাত্রীরা যাওয়ার পথে কিংবা ফেরার পথে গরুড়গঙ্গায় স্নান করে জল থেকে নুড়ি তুলে নেয় এবং গরুড় গঙ্গার নুড়িটিকে যত্ন করে সঙ্গে আনে। গঙ্গার জল স্বচ্ছ, অগভীর ও স্রোতপূর্ণ। এখানকার স্থানীয় লোকেরা এবং যাত্রীরা সকলেই গরুড়গঙ্গার জল পানীয়জল হিসাবে ব্যবহার করে।

গরুড় গঙ্গার পুলের অপর পারে বদরিনাথের পথ। পথের ধারে অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ ও গরুড় ভগবানের দু'টি প্রাচীন মন্দির যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এখানে সামান্যক্ষণ বিশ্রাম করে চটির দেব-দেবীকে প্রণাম করে আবার আমাদের পথ চলা সুরু হয়। পথ চড়াই। চড়াই পথে ওঠার সময় হঠাৎ একটি অন্ধ যাত্রীকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তোমার আর সঙ্গী কোথায় ? কার সাহায্যেই বা তুমি এই দুর্গম পথে এসেছ ভাই ?

সহাস্যে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় সে, এই হতভাগা জন্মান্ধ

সুরদাস যাত্রিকের সঙ্গী হলেন বদরিনাথজী। তাঁর কৃপায় এসেছি এ পথে আর যাবও তাঁর কাছে।

এর পরে আর কোন প্রশ্নই করতে পারলাম না অন্ধ সুরদাসকে। বাকি পথটা নীরবে পৌঁছে গেলাম টঙ্গনী চটিতে। ইচ্ছা ছিল টঙ্গনী চটিতে কিছুটা বিশ্রাম করি, কিন্তু মাছির দৌরাত্ম্য দেখে আর একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা হলনা। টঙ্গনী চটি থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, রয়ে গেল অন্ধ সুরদাস।

টঙ্গনী চটির দু'মাইলের পর পাতালগঙ্গা চটি। পাতালগঙ্গার কাছে কিছুটা পথ খুবই বিপজ্জনক। পথ সঙ্কীর্ণ ও ঝুরঝুরে কালো ঝামায় পরিপূর্ণ। যে কোন মুহূর্তে পথ ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা। পথের পাশে গভীর খদ। এই পথটুকু যাত্রীদের অতি সন্তর্পণে যাওয়া আসা করতে হয়। দৈবাৎ যদি কোন যাত্রীর পা একবার পিছলায়, তা হলে আর রক্ষা নেই, একেবারে পাতাল রাজ্যের অতিথি হতে হবে। প্রতি বছরই পাহাড়ের ধ্বস নেমে এই পথ বন্ধ হয়ে যায়। তীর্থযাত্রীদের সুবিধের জন্যে যাত্রাকালীন ধ্বস নামা অংশ পরিষ্কার করে নতুন পথ তৈরী করা হয়। সরকারী কুলীরা এখানে সব সময়ে মোতায়েন থাকে। বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে কিছুটা নেমে এসে পাতালগঙ্গাকে স্পষ্ট দেখা যায়। পাতালগঙ্গা তো নয় যেন সুবিস্তীর্ণ নুড়ি গঙ্গা। গঙ্গায় জল নেই বললেই চলে। গঙ্গার তীরেই হলো পাতালগঙ্গা চটি। এখানে যাত্রীদের থাকার তেমন কোন সুবিধে নেই, তাছাড়া এই চটিতে পানীয় জলের খুবই অভাব।

পাতালগঙ্গার দু'মাইলের পর গুলাব চটি। গুলাব চটিতে না থেমে আরো দু'মাইল পথ অতিক্রম করে কর্মনাশা নদীর তীরে অবস্থিত কুমারচটিতে এসে পৌঁছলাম। পথের পাশে একটা চটিতে পিঠঝুলি নামিয়ে বেশ কিছুটা বিশ্রাম করে নিই। বিশ্রামান্তে আবার পথ চলি। আমাদের আজকের লক্ষ্যস্থল হলো যোশীমঠ।

কুমারচটির দু'মাইল পর খনোটী চটি। এই চটির অল্প কিছু নীচে

ধ্যানবদরির মন্দির আছে। কেদারনাথের পথে আছেন পঞ্চম কেদার আর এদিকে বদরিনাথের পথে বিশালবদরি, ভবিষ্যবদরি, ধ্যানবদরি, যোগবদরি, ও আদিবদরি নামে পঞ্চ বদরি আছেন। পথে ঝড়কুলা ও সিংহদ্বার বা সিংধারা অতিক্রম করে এগিয়ে এলাম যোশীমঠের দিকে। আর মাত্র দেড় মাইল পথ বাকি। যোশীমঠের কাছ বরাবর এসে দেখি পথ দু'ভাগে ভাগ হয়ে একটি গিয়েছে সোজা যোশীমঠে অপরটি নীচ দিয়ে গিয়েছে বিষ্ণুপ্রয়াগের দিকে। সন্ধ্যার দিকে আমরা ৬,২০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত ভগবান শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত যোশীমঠে এসে পৌছলাম।

যোশীমঠের অপর নাম হলো জ্যোতির্মঠ। এইখানে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে গেল বিগত দিনের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অত্যাচারের কথা। বুদ্ধদেবের তিরোধনের পর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যথেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রভাবে বৈদিক ধর্ম ভারত থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়—ঠিক সেই সঙ্কট মুহূর্তে 'ধর্ম সংস্থাপনার্থায়' অর্থাৎ ভারতের ধর্ম, ভারতের কর্ম ও ভারতের জীবনকে পুনর্জীবিত করার জন্যে দেবাদিদেব পরমেশ্বর শঙ্কারাচার্যরূপ ধারণ করে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে যথেচ্ছাচারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাত থেকে ভারতের ধর্মকে রক্ষা করে পুনঃ সংস্থাপন করেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য যে চারিটি মঠ স্থাপন করেন তার মধ্যে উত্তরে বদরিকাশ্রমের জ্যোতির্মঠই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই মঠ। আমরা এত বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে যোশীমঠে এসেও ভগবান শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠবাড়ী দেখতে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তাই ঠিক করলাম, বদরিনাথ থেকে ফেরার পথে দিনের আলোয় অদেখা যোশীমঠকে ভাল করে দেখে যাব।

রাতের আশ্রয়ের জন্যে এসে উঠলাম নৃসিংহদেবের মন্দিরের কাছাকাছি একটা চটিতে। আমাদের চটির পাশ দিয়ে একটি পথ নীতিগিরিবর্ত্ম পার হয়ে চলে গিয়েছে পশ্চিম তিব্বতে অবস্থিত

হিমতীর্থ কৈলাস-মানসসরোবরের দিকে। পথ দুর্গম। হিমতীর্থ কৈলাস-মানসসরোবর যাওয়ার কিঞ্চিৎ সুগম পথ হলো আলমোড়ার পথ। এই পথে লিপুগিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে যাত্রীরা কৈলাস-মানসসরোবর দর্শনে যায়। হিমতীর্থ কৈলাস-মানসসরোবর যাত্রীর প্রকৃষ্ট সময় হলো জুন-জুলাই মাস। যোশীমঠ থেকে নীতিগিরিবর্ত্মের দূরত্ব হলো চুয়াল্লিশ মাইল আর বদরিনাথের দূরত্ব হলো উনিশ মাইল। নীতিগিরিবর্ত্মের পথে বারো মাইল দূরে ভবিষ্যবদরি অবস্থিত। ইনি পঞ্চবদরির অন্যতম বদরি।

মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি শুনে নৃসিংহ ভগবানের সন্ধ্যা আরতি দেখার জন্যে ছুটে গেলাম মন্দিরে। দেবারতির সঙ্গে দর্শন করলাম দেবতা নৃসিংহ ভগবানকে। মুক্তিদাতা নৃসিংহ ভগবান হলেন যোশী মঠের প্রধান দেবতা। নৃসিংহদেবের মন্দিরে বদরিনাথের গদি আছে। শীতের ছ'মাস উখী মঠ থেকে যেমন কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয় সেইরূপ ঐ ছ'মাস যোশীমঠ থেকে বদরিনাথের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। বদরিনাথের পূজারী রাওল সাহেবও শীতের ছ'মাস যোশীমঠে বাস করেন।

নৃসিংহদেবের মন্দিরের ভিতর পার্বতীদেবীরও একটি মন্দির আছে। পার্বতীদেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণ-বলরাম, গণেশ, নবদুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর সুন্দর সুন্দর মূর্তি আছে।

মন্দির পরিক্রমার পথে পার্বতী দেবীর মন্দিরের পিছনে গুহার মত ছোট একটি প্রকোষ্ঠ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। প্রকোষ্ঠের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি, এক গৌরকান্তি তরুণ সন্ন্যাসী বসে আছেন। পূজারীদের কাছে শুনলাম ইনি বহুদিন ধরে এই উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করছেন, সন্ন্যাসী কখনো এখানে থাকেন, কখনো বা পর্বতের উপর হিমরাজ্যে গমন করেন। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন, চিরং জীবতু। সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা হলো। সদালাপী

মিষ্টভাষী তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে আমরা খুবই প্রীত হলাম। সন্ন্যাসীর মুখে শুনলাম, এই উত্তরাখণ্ডে আজও কত শত সাধু-সন্ন্যাসী জপতপে মগ্ন আছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে তীর্থ। 'সাধুনা ক্রিয়তে তীর্থঃ।'

রাত অধিক হওয়ার জন্যে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে চটিতে ফিরে এলাম। আজ রাতে চটিওয়ালাই আমাদের রান্না করে দেওয়ার ভার নিয়েছে। এর জন্যে চটিওয়ালাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে এই যা। রাত্রে খাওয়ার পর তিন জনেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছি—এমন সময় বিমল বললে, নৃসিংহ ভগবানের গল্প শুনবি ?

তুই আবার কোথা থেকে শুনলি নৃসিংহ ভগবানের গল্প ?

মন্দির থেকে ফেরার পথে মন্দিরের এক পূজারীর কাছে শুনেছি এই গল্প। পুরাকালে এই অঞ্চলে নৃসিংহ ভগবানের এক পরম ভক্ত রাজা বাস করতেন। নৃসিংহদেব ভক্তের প্রতি প্রীত হয়ে অতিথি বেশে একদিন রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন। রাজা তখন কার্যব্যপদেশে অন্যত্র গিয়েছিলেন। রাণী অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা করে তাঁকে পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করালেন। ভোজনান্তে অতিথি বেশী ভগবান নৃসিংহদেব রাজার পালঙ্কে শয়ন করে নিদ্রা যান। রাজা বাড়ী ফিরে নিজের পালঙ্কে একজন অপরিচিত পুরুষকে নিদ্রা যেতে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নিদ্রিত পুরুষের হাতে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। নিদ্রিত অতিথির ক্ষত স্থান দিয়ে রক্তের পরিবর্তে দুধের ধারা নির্গত হতে দেখে রাজা-রাণী উভয়ে খুব বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরে ভগবান নৃসিংহদেব নিজ মূর্তিতে রাজা-রাণীকে দর্শন দিয়ে অদৃশ্য হন। রাজা তখুনি মন্দিরে ছুটে গিয়ে দেখেন যে, অতিথির হাতে যে স্থানে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছিলেন, মন্দিরস্থ ভগবান নৃসিংহদেবের হাতে ঠিক সেই স্থানে ঐ আঘাতের চিহ্ন। এই ব্যাপার দেখে রাজা আরো বিস্ময়ান্বিত ও চিন্তিত হয়ে ওঠেন। লোকের ধারণা যতদিন এই হাত নৃসিংহদেবের মূর্তিতে লেগে থাকবে ততদিন বদরিকাশ্রমে

নিয়মিত বদরিনারায়ণের পূজা হবে। আর যেদিন কাটা হাত নৃসিংহ-দেবের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সেদিন থেকে বদরিনাথের পথ মর্ত্যলোকবাসীদের জন্যে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

বিমলের মুখে নৃসিংহ ভগবানের গল্প শুনতে শুনতে নিদ্রায় আমাদের চোখ জুড়ে এলো। গল্প শেষ হতেই আমরা যে যার পাশ ফিরে শুলাম।

পূর্বে হিমতীর্থ কেদার-বদরির হাঁটা পথ ছিল হরিদ্বার থেকে। দিন দিন পথঘাটের উন্নতিসাধন হওয়ায় হাঁটা পথের দূরত্ব কমে গিয়েছে। এখন যাত্রীদের আর বেশী কষ্ট করে হরিদ্বার থেকে হাঁটতে হয় না। বাস এগিয়ে এসেছে অনেকটা পথ; কালে বাসপথকে আরো দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তার প্রস্তুতি চলেছে পথের সর্বত্রই। বাসপথ যত এগিয়ে যাবে, যাত্রীর সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাবে। ফলে পায়ে হেঁটে হিমতীর্থ কেদার-বদরি, যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী যাওয়ার যে আনন্দ, সে আনন্দও যাবে কমে।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পিঠঝুলি কাঁধে তুলে নিয়ে বদরিনাথজীকে স্মরণ করে পথ চলা সুরু করে দিই। প্রভাতী সূর্যের রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে চলাচলের পথ। মহানন্দে বদরিনাথজীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে রক্তরাঙা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মনে আজ পথ চলার উদ্যমের অন্ত নেই। কারণ বহুদিনের বাঞ্ছিত উত্তরাখণ্ডের হিমাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম বদরীনাথে পৌছতে আর মাত্র উনিশ মাইল পথ বাকি।

বর্তমানে কেদার-বদরির হাঁটা পথ হলো মোট একশ উনআশি মাইল। সাত দিন যাবৎ আমরা ক্রমাগত হেঁটে চলেছি পথ। চলার পথে বিভিন্ন চটিতে, ধর্মশালায় অথবা কোন দোকানে বিশ্রাম কিংবা রাত্রিবাসের জন্যে আশ্রয় নিয়েছি। বেশীর ভাগ সময়ই আমাদের কেটেছে পথে, পথ চলার কাজে।

যোশীমঠ থেকে পথ উৎরাই। দু'মাইল পথ উৎরাই করার পর বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুগঙ্গার পুল পার হয়ে বদরিনাথের পথ। বিষ্ণুপ্রয়াগ পঞ্চ-প্রয়াগের অন্যতম প্রয়াগ। এখানে নগেন্দ্রকন্দর বিদীর্ণ করে পুণ্য-সলিলা বিষ্ণুগঙ্গা বিপুল উচ্ছ্বাসে ছুটে এসে কল্লোলিনী অলকানন্দার জীবনে জীবন সমর্পণ করেছে।

ঠিক যে স্থানটিতে দুটি পবিত্র নদী এসে পরস্পর পরস্পরে মিলিত হয়, তাকে বলা হয় সঙ্গম স্থান। প্রতিটি হিন্দুর চোখে পবিত্র নদীর সঙ্গম স্থানগুলো এক একটি প্রয়াগ তীর্থ বিশেষ। এখানে বিষ্ণুগঙ্গা ও কল্লোলিনী অলকানন্দার আবেগভরা মিলনে গড়ে উঠেছে বিষ্ণুপ্রয়াগ। সঙ্গম দর্শনের জন্যে পথ থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে আসতে হয়। সঙ্গমের ঘাট থেকে দুই নদীর মিলনানন্দ খুবই চমৎকার দেখায়।

"কুলকুল কল-হাসি
সুগভীর বারি রাশি
ঢেউগুলি মিশামিশি
কি ভালবাসায় রে।"

বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমে তীর্থযাত্রীদের স্নান করার সুবিধের জন্যে ঘাটে লোহার শিকল বাঁধা আছে। সঙ্গম স্থানটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভীষণ স্রোতবেগ—তবুও স্নানার্থীর ভিড়ের কমতি নেই। যাত্রীরা অতি সাবধানে লোহার শিকল ধরে সঙ্গমে স্নান করে। সঙ্গম স্থানের উপরেই ভগবান বিষ্ণুর একটি ছোট মন্দির আছে। শোনা যায়, পরমভক্ত নারদ এইস্থানে ভগবান বিষ্ণুর তপস্যা করে সর্বজ্ঞত্ব বর লাভ করেন।

বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে পথ বরাবর অলকানন্দার ধার ঘেঁসে এগিয়ে গিয়েছে। বিষ্ণুপ্রয়াগে ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করে আমরাও এগিয়ে যাই সামনের পথে। পথের অনেক নীচ দিয়ে কলস্বনা অলকানন্দা নৃত্যের ভঙ্গিমায় যুগ যুগ ধরে বিরামহীন, বিশ্রামহীনভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নদীর এ চলার শেষ কোথায় কে জানে?

বিষ্ণু প্রয়াগের এক মাইল পর বলদেও চটি। চটি অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলাম এক পঙ্গু বসে বসে পা ঘসে চড়াই-উৎরাই পথে মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন, নিয়ে চলেছে বদরিকাশ্রমে বদরিনারায়ণ দর্শনে। তার কাছে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, এই এত উঁচু পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই পথে তোমার চলতে কোন কষ্ট হচ্ছে না ?

না, কোন কষ্টই আমার হচ্ছে না। ছোট্ট একটি জবাব দিয়ে বদরিনাথজীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে লাগল সে।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলাম তার গমন পথের দিকে। কি সে শক্তি, কি সে আকর্ষণ ? যার টানে অন্ধ, পঙ্গু, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এই দুর্গম পথের পথিক হয়েছে ? কে জবাব দেবে ?

পর পর বিষ্ণুপ্রয়াগ, বলদেও ও ঘাটচটি অতিক্রম করে এগিয়ে এলাম পাণ্ডুকেশ্বর চটিতে। পাণ্ডুকেশ্বর বেশ বড় গ্রাম। এখানে দোকান, ডাক্তারখানা, ডাকঘর, ধর্মশালা ও চটি সবই আছে। এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে দু'টি প্রাচীন মন্দির উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটি হলো, পঞ্চবদরির অন্যতম যোগবদরির মন্দির আর অপরটি হলো বাসুদেবের মন্দির। মন্দিরের ভিতর একটি উঁচু চত্বর পেরিয়ে আমরা প্রথমে প্রবেশ করলাম যোগবদরির মন্দিরে। দর্শন করলাম দেবতা যোগবদরিকে। দেবতা চতুর্ভুজ বদরিনারায়ণ যোগাবস্থায় এই মন্দিরে বিরাজিত। পরে বাসুদেব মন্দিরে তাম্র-মূর্তিতে বিরাজিত চতুর্ভুজ দেবতা বাসুদেবকেও দর্শন করলাম।

মন্দিরের পিছনে পাণ্ডুচৌকী নামে একটি ত্রিকোণাকৃতি পাহাড় আছে। পাণ্ডুচৌকী পাহাড়টিকে দেখিয়ে পাণ্ডারা যাত্রীদের বলে, ঐ পাহাড়ে রাজা পাণ্ডু তাঁর দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে বাস করতেন। রাজা পাণ্ডুর বাসস্থান ছিল বলে এই স্থানের নাম হয়েছে পাণ্ডুকেশ্বর

পাণ্ডুকেশ্বর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাণ্ডারা যাত্রীদের আরো একটি প্রচলিত কাহিনী বলে থাকে। মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব এই পথ দিয়েই গমন করেছিলেন। বহু পার্বত্য পথ অতিক্রমের পর দ্রৌপদী শেষে এইস্থানে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পাণ্ডবদের স্মৃতিকে চিরন্তন করার জন্যে এই স্থানের নাম হয়েছে পাণ্ডুকেশ্বর।

পাণ্ডুকেশ্বর থেকে এক মাইল পিছনে অর্থাৎ ঘাট ও পাণ্ডুকেশ্বর চটির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় শিখ সম্প্রদায়ের একটি গুরদোয়ারা আছে। গুরদোয়ারার পাশ দিয়ে অলকানন্দার পুল পার হয়ে হেমনদীর ধার দিয়ে একটি পথ সোজা ১৪,০০০ ফিট উঁচে চলে গিয়েছে নন্দনকানন ও হেমকুণ্ড অথবা লোকপালের দিকে।

হেমকুণ্ড অথবা লোকপাল হলো শিখ-সম্প্রদায়ের পবিত্র হিমতীর্থ। এখানে হেমকুণ্ড অর্থাৎ হিমহ্রদের সামনে একটি গুরদোয়ারা আছে। বহুদিন যাবৎ শিখসম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মগুরু গুরুগোবিন্দজী এই হেমকুণ্ডের কিনারে বসে তপস্যা করেছিলেন। তাছাড়া এখানে লক্ষ্মণজীর একটি জীর্ণ প্রায় মন্দির আছে। শিখসম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রীরা হিমতীর্থ হেমকুণ্ড অথবা লোকপাল দর্শনে আসে। হেমকুণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ব্রহ্মকমল ও ফেনকলম পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। এই ব্রহ্মকমল ও ফেনকমল পুষ্প দিয়েই কেদারনাথ ও বদরিনাথের পূজা হয়।

হেমকুণ্ড অথবা লোকপাল থেকে চার মাইল পথ নীচে গাংরিয়া নামক জায়গায় ফিরে এসে ভিন্ন পথে নন্দনকানন দর্শন করতে যেতে হয়। নন্দনকানন হলো এক বিরাট মনোরম প্রাকৃতিক পুষ্প উদ্যান। এখানকার নানাবর্ণের পুষ্পসম্ভার দর্শন করা মুহূর্তে যাত্রীদের মানসকমলও উন্মীলিত হয়ে ওঠে। যাত্রী তখন যেদিকে চোখ ফেরায় সেদিকেই সৃষ্টির মাঝে দর্শন করে স্রষ্টাকে।

নন্দনকানন যাত্রার প্রকৃষ্ট সময় হলো আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস। এই সময় প্রাকৃতিক পুষ্পউদ্যান নন্দনকানন নানাজাতীয় পুষ্পে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে।

পাণ্ডুকেশ্বর চটিতে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা সুরু করি। লক্ষ্যস্থল হলো বহুদিনের ঈপ্সিত হিমতীর্থ বদরিকাশ্রম। পথচলার সময় পাহাড়ী ব্যবসায়ীদের ছাগল-ভেড়ার পালগুলো যাত্রীদের পথচলার খুবই অসুবিধা ঘটায়! এই ছাগল-ভেড়ার ব্যূহ ভেদ করে যাওয়া যাত্রীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেই সময় যাত্রীদের খুব সতর্ক হয়ে পথ চলতে হয়। পাণ্ডুকেশ্বর চটিকে পিছনে ফেলে আমরা এসে হাজির হলাম বিনায়ক চটিতে।

পাণ্ডুকেশ্বরের মত এই চটি তেমন বড় নয়। তাহলেও পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত থাকায় বিনায়ক চটিতেই দিবাহারের মনস্থ করি। পূর্বে এই পথে পানীয় জলের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না, যার ফলে যাত্রীদের নানা অসুখের কবলে পড়তে হতো। বিশেষ করে পানীয় জলের জন্যে যাত্রীদের পেটের পীড়ায় ভুগতে হতো ভীষণভাবে। বর্তমানে যাত্রীদের সুবিধের জন্যে পি-ডব্লু-ডি থেকে কেদার-বদরির পথে সর্বত্রই পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছে। কেদার-বদরি পরিভ্রমণের সময় প্রত্যেক যাত্রীর বিশেষ করে পানীয় জলের প্রতি সতর্ক হওয়া উচিত। পথে পি-ডব্লু-ডি কলের জল ব্যতীত জলপান করা উচিত নয়। কারণ দূষিত জল পানে তীর্থযাত্রীদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বিনায়ক চটির মনোমত একটি চটি বেছে নিয়ে, কাঁধ থেকে পিঠঝুলিগুলো সব নামিয়ে দিবাহারের জন্যে রান্না সুরু করেছি, এমন সময় একদল বর্ষীয়সী বাঙ্গালী বিধবা যাত্রী এসে হাজির হলেন। চটিতে পা না দিতেই তাদের মধ্যে বেঁধে গেল ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটি। পরে জানা গেল টাকাপয়সার ভাগাভাগি নিয়েই এই গণ্ডগোল। এ স্বভাব মেয়েদের কোন দিনও যাবার নয়। অনেক ছাড়তে হলেও সামান্য নিয়ে মারামারি করতে তারা চিরকাল অভ্যস্ত। মনে মনে ভাবলাম, এদের এত কষ্ট করে তীর্থ করার ফলংকি? মন যখন এমনি সংস্কারবদ্ধ—তখন দেবতাদর্শনের পুণ্য কতটুকুই বা সঞ্চিত হবে? ওদিকে আর কান না দিয়ে আমরা নিজেদের রান্নার কাজে মন দিলাম।

সব রান্না হয়ে গেল ?

একটা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালাম। ওদের দলেরই একজন। বয়স খুব বেশী নয়, তবুও বাঙ্গালী ঘরের বিধবা—মুখে কৃচ্ছসাধনের সুস্পষ্ট ছাপ আঁকা, কেমন যেন একটা করুণ ভাব তাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে।

সব আর কি ? আলু ভাতে ভাত, আমি জবাব দিলাম।

শুধু আলু ভাতে আর ভাত! ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের আভাস।

না, ঘিও আছে। সেটা যেন অমূল্য এমনভাবে জবাব দিলাম।

সামান্য একটু হেসে তিনি বললেন, ঘি আছে না হয় বুঝলাম, কিন্তু শুধু তাই দিয়েই কি খাওয়া হয়ে যাবে ?

কেন যাবে না ? আজ তো তবু আলু ভাতে ভাত আছে; এইতো সেদিন কেদারনাথে যাবার পথে শুধু নুন আর ভাত—তাই মেরে দিলাম।

তা সে যাক, আমাদের সঙ্গে তরকারী আছে—কিছু দিই, কি বলুন ?

না, না তরকারী চাই না। আর তাছাড়া আপনাদের দলে যে যুদ্ধ বেঁধেছে এখন তাই সামলান তো আগে।

ভদ্রমহিলা হেসে ফেলে বললেন, ও যুদ্ধ তো রোজই লেগে আছে। একটু পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

আপনি এদের দলে এসে জুটলেন কি করে ?

তিনি এবার একটু থেমে গেলেন। পরে খুব আস্তে আস্তে বললেন, তিনকুলে যার কেউ নেই—তার এরা ছাড়া আর গতিই বা কি বলুন ?

বুঝলাম কোন ক্ষতস্থানে অজ্ঞাতেই আঘাত করেছি। এ প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে ভদ্রমহিলাকে খানিকটা খুশী করবার জন্যে বললাম, কৈ দিন তরকারী ?

আমাদের খাবার সময় ভদ্রমহিলা পাশে বসে তরকারী পরিবেশন করতে লাগলেন। সেদিন খাবার সময় কেন জানি না, বার বার

কেবল মায়ের কথাই মনে পড়ছিল। খাওয়াদাওয়া সেরে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বললাম, জীবনে আপনার সঙ্গে আর আমাদের দেখা হবে কিনা জানি না, কিন্তু আজকের দিনটাকে আমরা কোনদিন ভুলব না। জয় বদরিনাথ, বলে চটি থেকে বেরিয়ে পড়লাম পথে।

বদরিকাশ্রমে পৌঁছতে মাত্র এগার মাইল পথ বাকি। পথে চলার সময় মাঝে মাঝে পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা যাত্রীদের ঘিরে ধরে তখন খুবই বিরক্তিকর মনে হয়। আমাদের সঙ্গে একটি খুদে দল নাচতে নাচতে, মহারাজ, ছুঁই দেও, সূতা দেও, বলে পিছন পিছন চলতে লাগল। কিছু না নিয়ে এরা যাত্রীদের সঙ্গ ছাড়ে না। আমাদের কাছে ছুঁই সূতা না থাকায়, দু'একটা করে পয়সা দিয়ে খুদে দলটিকে বিদায় করলাম।

বিনায়ক চটির দেড় মাইল পর লামবাগড় চটি। তার পরেই অলকানন্দা আর ঘৃতগঙ্গার সঙ্গম স্থান। অলকানন্দা এখানে প্রবল উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে আপনার খেয়ালে—দুপাশে অজস্র ফেনার রাশি তুলে। ঘৃতগঙ্গার উপর ছোট কাঠের পুল পার হয়ে কিছুটা চড়াই এর পর হনুমানচটি। চটির প্রবেশ পথেই একটা ছোট মন্দির যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর মূর্তি। আর চটির শেষ প্রান্তে, হনুমানজীর মন্দির অবস্থিত। হনুমানজীর নামানুসারে এই চটির নামকরণ হয়েছে হনুমানচটি।

হনুমানজীর মন্দিরাভ্যন্তরে রয়েছে, হনুমানজী, অঞ্জনমাতা ও গণেশজীর মূর্তি। পুরাকালে এই স্থানে বৈখানস মুনির আশ্রম ছিল। সেই কারণে কেউ কেউ এই স্থানটিকে বৈখানস তীর্থও বলে থাকে। মহারাজা মারুৎ সেই সময় একবার এই বৈখানসতীর্থে মহাযজ্ঞের এক বিরাট অনুষ্ঠান করেছিলেন। এখানকার মাটি খুঁড়লে আজও মাটির তলায় যজ্ঞের নিদর্শন স্বরূপ পোড়াকাঠ, তিল, যব ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। কেদারনাথের পথে রামওয়ারা চটির মত বদরিনাথের পথে এই হনুমান চটিই হলো সর্বশেষ চটি।

এখান থেকে বদরিনাথের দূরত্ব আর মাত্র পাঁচ মাইল, পথ চড়াই। পাঁচমাইল পথ একদমে পাড়ি দেব বলে এখানে একটু বসে দম নিয়ে নিই। গন্তব্য স্থানে না পৌঁছনো পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। কতক্ষণে বদরিকাশ্রমে পৌঁছে বদরিনারায়ণের দর্শন পাব, এই চিন্তায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

"থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়
নিমিষে যোজন ফরসা।
মরণ হরণ নিখিল শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা।"

মাভৈঃ! বলে পিঠঝুলি কাঁধে তুলে নিয়ে ফিনিস্ দেওয়ার মত জোর কদমে চালিয়ে দিলাম পা।

এত কাছে এসেও যেন আর ধৈর্য ধরে না। সামান্য পাঁচ মাইল পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। যত ওপরের দিকে উঠতে থাকি চলার গতি ততই কমে যায়। বাকি পথটুকু শেষ করা খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। এপথ কষ্টের পথ, কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বলেই এখানকার তীর্থের মাহাত্ম্য অন্যান্য তীর্থের মাহাত্ম্যের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এই পবিত্র বদরিকাশ্রম তীর্থে এলে মানুষ নিজেকে ভাগ্যবান, পুণ্যবান মনে করে। সংসার তাপদগ্ধ মানুষের কাছে হিমতীর্থ বদরিনাথ হলো মহৌষধি স্বরূপ। এই ত্রিলোক-দুর্লভ তীর্থে এলে মানুষ শান্তি পায়। ভুলে যায় পৃথিবীর জ্বালাযন্ত্রণার কথা। ছ'ফার্লাং দূরে থেকে ছবির মত চোখের সামনে বদরিনাথের মন্দির ও সমস্ত বদরিকাশ্রম ভেসে উঠল।

আর দেখা গেল বদরিকাশ্রমের মধ্যমণি স্বরূপ নীলকণ্ঠ পর্বতের তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ চূড়া। একটু কষ্ট করে সামান্য পথ চললেই পৌঁছে যাব ত্রিলোক-দুর্লভ তীর্থ বদরিকাশ্রমে। বহুদিনের বাসনা আজ সফল হবে, তাই মন আনন্দে ভরে উঠেছে। বদরিনাথজীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে ঋষিগঙ্গার পুল পার হয়ে সন্ধ্যার দিকে পৌঁছে গেলাম ১০,৩০০ ফিট

উচ্চে অবস্থিত বিষ্ণুলোক বদরিকাশ্রমে। এতদিন যে কষ্ট করেছি—যে আশায় এতখানি পথ হেঁটেছি আজ যেন তা সার্থক হলো বদরিকাশ্রমের পূতঃ রেণু স্পর্শে।

আমরা পাণ্ডা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টের যাত্রী। তাই সরসারি পাণ্ডার ডেরায় এসে উঠলাম। পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয় হলো। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। যাত্রাকালীন যাত্রীদের সুবিধের জন্যে তিনি স্ত্রী পুত্র নিয়ে এখানে এসে বসবাস করেন। যাত্রীদের দেখাশোনা করেন। পাণ্ডা ঠাকুর বললেন, ধূলো পায়ে দেবতা বদরিনাথজীকে দর্শন করবেন চলুন।

পিঠঝুলিগুলো ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে বিশ্রাম না নিয়েই পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাজারের মধ্যে দিয়ে মন্দিরে যাওয়ার পথ।

বদরিনাথজীর মন্দিরটি অলকানন্দার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পথ থেকে কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠতে হয়। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে নহবতখানা, পরে দেবতার মূল মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গন। মূল মন্দিরের ভিতর যখন প্রবেশ করি তখন মহাঘটা করে বদরিনাথজীর সন্ধ্যা আরতি হচ্ছিল। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে দর্শনার্থী যাত্রীতে ভরে গিয়েছে। আমরা সকলেই বদরিনাথজীর সন্ধ্যা আরতি দর্শন করলাম। আরতি শেষে যাত্রীদল কাতর কণ্ঠে বদরিনাথজীর কাছে কত কি সব চাইতে লাগল।

হে ঠাকুর! আমাকেও কি তুমি চাওয়ার বাসনায় ভুলিয়ে নিজে দূরে সরে দাঁড়াবে? না তা হবে না,

"আমি কিছুই চাইব না তো, রইব চেয়ে—
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।"

মন্দিরের ভিড় একটু কমতে বদরিনাথজীকে ভাল করে দর্শন করার জন্যে আমরা এগিয়ে গেলাম গর্ভগৃহের দ্বারের কাছে। বদরিনাজীর মূল





মন্দিরটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমে ভোগগৃহ, পরে নাটগৃহ ও সবশেষে হলো দেবতা বদরিনারায়ণের গর্ভগৃহ। এই গর্ভগৃহের মধ্যেই বদরিনাথজী বিরাজিত। কেবল রাওল সাহেব ছাড়া বদরিনাথজীর গৃহে অন্য কারুরই প্রবেশাধিকার নেই। গর্ভগৃহের সামনে একটি বড় থালা নিয়ে একজন পূজারী রাওল বসে দেবতার প্রসাদ বিতরণ ও প্রণামী গ্রহণের কাজ নীরবে সম্পাদন করছেন।

দেবতার প্রসাদ নিয়ে দূর থেকে মূল্যবান অলঙ্কারাদির দ্বারা সুসজ্জিত বদরিনাথজীকে দর্শন করলাম। বদরিনাথজীর দক্ষিণে গণেশ ও কুবের, বামে নর ও নারায়ণ এবং চরণ তলে উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি দেবতার মূর্তি আছে। মন্দিরের চাপরাশি বাইরে যাওয়ার জন্যে খুব তাড়া দিতে লাগলো। কারণ আরো অনেক দর্শনার্থী যাত্রী মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। নির্গমনের পথ দিয়ে বাইরে এলেই সামনে পড়ে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। মন্দিরটি খুবই ছোট। লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের একদিকে বদরিনাথজীর পাকশালা অপর দিকে রাওল সাহেবের দপ্তরখানা। বদরিনাথজী ও লক্ষ্মীমাতাকে প্রণাম করে রাত ন'টার সময় মন্দির থেকে ডেরায় ফিরে এলাম। রাতের আহার মন্দির থেকে ফেরার পথে বাজারেই সমাধা করে নিই। ঘরের দরজা বন্ধ করে পাণ্ডা ঠাকুরের প্রেরিত লেপ ও তোষক মুড়ি দিয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে পড়ি আর শোওয়া মাত্রই নিদ্রা। অনেকদিন এমন আরামে ঘুমাই নি।

২১শে. মে। রাত প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ি। রুদ্ধ ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি, প্রভাতী সূর্যের আলোয় বদরিকাশ্রমের চারিদিক ঝলমল করছে। পর্বতের বন্ধুর তুষার স্তর ও গগনচুম্বী শৃঙ্গগুলোও নানান রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। শ্বেতশুভ্র তুষারাবৃত নীলকণ্ঠ পর্বতের অঙ্গ থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে

ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত বদরিকাশ্রমে। যেন এক অখণ্ড জ্যোতি বদরি-নারায়ণের শিয়রে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। অপূর্ব রূপ এই পর্বতটির। এর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বিদেশী পর্যটকেরা নাম দিয়েছেন, 'কুইন্ অফ দি স্নো মাউন্টেন।' আমরা বলি, নীলকণ্ঠ। পর্বতটির গঠন ভঙ্গিমা দেখে মনে হয়, যেন সত্যিই কণ্ঠে হলাহল ধারণ করে শ্বেতশুভ্র উত্তরীয় অঙ্গে জড়িয়ে শান্ত, স্তব্ধ, মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আপনভোলা মহা-যোগী শঙ্কর।

দ্বিতীয়বার সমুদ্র মন্থনে হলাহল উত্থিত হলে দেবতারা প্রমাদ গুণলেন! বিষের জ্বালায় বুঝি পৃথিবী ছারখার হয়ে যায়। কে গ্রহণ করবে এই উগ্র বিষ? গ্রহণ করলেন দেবাদিদেব শঙ্কর নিজ কণ্ঠে। বিষের উগ্র প্রভাবে নীলবর্ণ হয়ে উঠলো তাঁর সমস্ত কণ্ঠ। তাই তো তিনি নীলকণ্ঠ। তুষারাবৃত পর্বত শিখরের একটু নিচে কালো বিন্দুর মত একটি বিন্দু দেখা যায়। ঠিক যেন নীলকণ্ঠের কণ্ঠচিহ্ন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠচিহ্ন এই পর্বতটির কণ্ঠে থাকার জন্যেই বোধহয় পর্বতটির নাম হয়েছে নীলকণ্ঠ।

বদরিকাশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মন আনন্দে ভরে ওঠে। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর কেবল প্রকৃতির সীমাহীন আনন্দের ছবিই চোখে পড়ে। মনে হয় যেন,

"কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে-বর্ণে, নির্নিমেষে উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।"

সকালবেলায় স্নান করার জন্যে পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে রওনা হলাম তপ্তকুণ্ডের দিকে। বদরিনারায়ণের মন্দিরের কিছু নীচে অলকানন্দার তীরে অবস্থিত এই কুণ্ড। তপ্তকুণ্ডকে লোকে বহ্নি তীর্থও ব'লে থাকে। রাস্তা থেকে কয়েকটি ধাপ নেমে তপ্তকুণ্ডে পৌঁছতে হয়। এই কুণ্ডের

জল বেশ গরম। এই জলে স্নান করলে মহাপাপীও নাকি শুদ্ধ হয়ে যায় এবং ক্রমে অন্তিমকালে মোক্ষ লাভ হয়।

হিমতীর্থ বদরিনাথ যাত্রীরা বদরিকাশ্রমে এসে সকলেই তপ্তকুণ্ডের জলে স্নান করে। এই কুণ্ডের উষ্ণ জলে স্নান করলে মোক্ষলাভ হয় কিনা জানি না তবে পথচলা জনিত দেহের সমস্ত ক্লান্তি যে এক মুহূর্তে বিদূরিত হয় এ কথা বেশ বলা যায়। অগ্নিদেবতাকে স্মরণ করে আমরাও নেমে পড়লাম তপ্তকুণ্ডে। কুণ্ডটি কিন্তু বেশী বড়ও নয় আর খুব গভীরও নয়। গভীরতায় মাত্র চার ফিট। চওড়ায় চৌদ্দ ফিট এবং লম্বায় ষোল ফিট। এই স্বল্প পরিসর কুণ্ডে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই একত্রে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে স্নান করতে হয়। স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্যে এই কুণ্ডে কোন পৃথক বন্দোবস্ত নেই। এখানে পূজা ও গুপ্ত দানের বিধি আছে।

তপ্তকুণ্ডের নীচে নদীগর্ভে নারদকুণ্ড নামে আর একটি কুণ্ড আছে। শোনা যায়, বৌদ্ধেরা নারায়ণের মূর্তিকে নারদ কুণ্ডে ফেলে দিয়ে নারায়ণের মূর্তির পরিবর্তে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। পরে ভগবান শঙ্করাচার্য স্বপ্নাদেশে সকল বিষয় অবগত হয়ে নারদকুণ্ডে ডুব দিয়ে নারায়ণজীর আসল মূর্তিটিকে পুনরুদ্ধার করেন এবং বুদ্ধের মূর্তিটি অলকানন্দায় বিসর্জন দিয়ে হিমালয়ের এই হিমাঞ্চলে বদরীবৃক্ষ অর্থাৎ কুলগাছের তলায় নারায়ণের মূর্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি নারায়ণ এখানে বদরী নামে খ্যাত হন। বদরিনাথ বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ। এখানকার মাহাত্ম্যের কথা বলে শেষ করা যায় না।

তপ্তকুণ্ডে স্নান করার সময় আলাপ হলো নবদ্বীপের কৃষ্ণদাস গোঁসাই নামে এক পরম বৈষ্ণবের সঙ্গে।

গোঁসাইজী বললেন, আরে মশাই, স্বর্গ মর্ত্য পাতালে অনেক তীর্থ আছে কিন্তু বদরিকাশ্রমের তুল্য তীর্থ ছিলও না হবেও না। যদি কেউ কথাপ্রসঙ্গেও একবার বদরি কথাটি উচ্চারণ করে তাহলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। বদরিকাশ্রমে পৌঁছে যদি কেউ বদরিনাথজীর দর্শন লাভ

করে তবে তার মুক্তি লাভ অনিবার্য। আর মহাপাপীও যদি এই বদরিতীর্থের কথা স্মরণ করে তবে তার পাপ নাশ হয়। এমনি হলো এই তীর্থের মাহাত্ম্য।

কৃষ্ণদাস গোঁসাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বদরিনারায়ণের নামকীর্তন সুরু করে দিলেন তারপর হঠাৎ হাউমাউ করে ছোট শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। বুঝলাম গোঁসাইজীর মনে ভাব উদয় হয়েছে। বললাম, গোঁসাইজী জল থেকে উঠে মন্দিরে যান।

কৃষ্ণদাস গোঁসাই তপ্তকুণ্ডের জল থেকে উঠেই সিক্তবস্ত্রে, নগ্নদেহে, দু'বাহু তুলে নৃত্য করতে করতে ছুটলেন বদরিনারায়ণজীর মন্দিরে। গোঁসাইজীর আর কোন দিকে খেয়াল ছিল না, ভক্তের লক্ষ্য তখন শুধু ভগবান।

আমরাও তপ্তকুণ্ডের জলে স্নানপর্ব সমাধা করে বাজার থেকে পূজার সামগ্রী কিনে পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে বদরিনারায়ণের মন্দিরে উপনীত হলাম। মন্দিরে এসে দেখি, দেবতার বাল্যভোগের আয়োজন চলেছে। নারায়ণের ভোগের সময় কোন যাত্রীকে দেবতার মূলমন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেই সময় দর্শনার্থী সকল যাত্রী-কেই অর্ঘ্য নিয়ে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। আমরা সকলেই ধৈর্য সহকারে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। ভগবান নারায়ণকে দর্শনের জন্যে কেবল অধৈর্য দেখলাম কৃষ্ণদাস গোঁসাইকে। তিনি দু'বাহু তুলে মন্দির প্রাঙ্গনে সমানে নৃত্য করে চলেছেন আর তার মধুর কণ্ঠ থেকে অনর্গল ভাবে বিস্ফুরিত হচ্ছে হরিগুণ নাম।

মুখে কাপড় বেঁধে পাকশাল থেকে বাহকেরা দেবতার ভোগ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মন্দিরে। একটু পরেই আরম্ভ হবে দেবতার বাল্য ভোগ। এখানে দিনে দু'বার বদরিনারায়ণের ভোগ হয়। সকালে বাল্যভোগ আর মধ্যাহ্নে অন্নভোগ। পুরীর মত বদরিকাশ্রমে প্রসাদ গ্রহণে কোন জাত বিচার নেই। ব্রাহ্মণই হোক আর চণ্ডালই হোক একের ভোগ অপরে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।

দেবতার ভোগ শেষ হতেই পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে ভিড় ঠেলে আমরা নাটমন্দিরে প্রবেশ করলাম। যাত্রীদের গতিবিধি এই পর্যন্ত। তারপর কোন যাত্রীর প্রবেশাধিকার নেই। পাণ্ডাঠাকুর দূর থেকেই বদরিনারায়ণজীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে আমাদের পূজার অর্ঘ্য একটি কানা উঁচু থালায় ঢেলে দিলেন। একজন রাওল সাহেব সেই থালা থেকে দেবতার প্রসাদ স্বরূপ কিছু আমাদের হাতে তুলে দিলেন। প্রসাদ হাতে নিয়ে দূর থেকেই দাঁড়িয়ে নারায়ণজীকে দর্শন করতে লাগলাম। এই সময় নানা মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি শোভিত নারায়ণজীকে অন্ধকার গর্ভগৃহে তত স্পষ্ট দেখা যায় না। তখন দেবতার আসল মূর্তির বদলে তাঁর অঙ্গের মণিমাণক্য খচিত বেশভূষার চাকচিক্যই যাত্রীদের চোখে পড়ে।

পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, বদরিনারায়ণের নির্বাণ দর্শনের প্রকৃষ্ট সময় কখন ?

প্রতিদিন প্রত্যুষে বদরিনারায়ণজীর স্নানের সময় হলো দেবতার নির্বাণরূপ দর্শনের উৎকৃষ্ট সময়। কারণ ঐ সময় দেবতার অঙ্গ থেকে সব অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ খুলে রাখা হয়। যাত্রীরা তখন বদরিনারায়ণের আসল মূর্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে। বদরিনারায়ণের নির্বাণ রূপ দর্শনই হলো মধুর ও উপভোগ্য। বেলা হওয়ার জন্যে দেবতার নির্বাণরূপ দর্শন করা আমাদের ভাগ্যে ঘটলো না। তবুও দৃষ্টি সজাগ রেখে অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদির ফাঁক ফুঁক থেকে দেবতার আসল মূর্তি দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এমন সময় কৃষ্ণদাস গোঁসাই এর একটা হাত এসে পড়লো আমার পিঠে। ও ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখছেন ?

দেখছি, বদরিনারায়ণজীর মূর্তি।

গোঁসাইজী হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, জয় বদরিনারায়ণজীর জয় !

জয় শিবশম্ভু ! বলে কে যেন পিছন থেকে চীৎকার করে উঠলো। পর মুহূর্তেই শোনা গেল, জয় কালি ! জয় কালি !

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি এক শক্তিসাধক তান্ত্রিক। পাণ্ডাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি, ভগবান বিষ্ণুর আশ্রমে শিব, শাক্ত, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রী এসেছে যে? ব্যাপার কি পাণ্ডাঠাকুর?

উত্তরে পাণ্ডাঠাকুর বললেন, বদরিনারায়ণের আসল যে কি মূর্তি তা আজও কেউ সঠিক বলতে পারে না। চতুর্ভুজ বলে বৈষ্ণবেরা বলেন বিষ্ণু মূর্তি। জটাজুটধারী শিবের মত বলে শৈবেরা বলেন শিব মূর্তি। নাভিমণ্ডলে শক্তির লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় শাক্ত তীর্থযাত্রীরা বলেন মহাশক্তি। আবার বুদ্ধদেবের মত ধ্যানমগ্ন বলে বৌদ্ধেরা বলেন ধ্যানীবুদ্ধ। জৈনসম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রীদের চোখে এই মূর্তি হলো তীর্থঙ্করের মূর্তি।

একটু থামলেন পাণ্ডাঠাকুর। কি যেন ভেবে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, মূর্তির যে রূপই হোক না কেন আসলে উনি বিষ্ণুই। আর এই পরম পবিত্র ত্রিলোক-দুর্লভ-তীর্থ বিষ্ণুরই আশ্রম। পুরাণে আছে, ভগবান বিষ্ণু একসময় এখানে তপস্যায় বসেছিলেন। তাঁকে রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করার জন্যে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বদরীবৃক্ষ অর্থাৎ কুল গাছ হয়েছিলেন। ভগবান বিষ্ণু সেই বদরীবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে বসে তপস্যা করেছিলেন বলে তিনি বদরী নামে জগতে খ্যাত হন।

বদরিনারায়ণের মূর্তির নীচে নর ও নারায়ণ নামে দুইটি মূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাণ্ডাঠাকুর পুরাণ বর্ণিত কাহিনী বলে প্রমাণ করতে চাইলেন যে এই মূর্তি বিষ্ণুরই মূর্তি আর এই আশ্রম বিষ্ণুরই আশ্রম, নর ও নারায়ণের মূর্তি দু'টি ভগবান বিষ্ণুরই দুই ভিন্ন রূপ।

কেন বিষ্ণু দুই ভিন্ন রূপ গ্রহণ করলেন সে কথাও পাণ্ডাঠাকুর শোনালেন। সহস্রকবচ নামে মহাপরাক্রমশালী এক দৈত্য ছিল। শিবের বরেই দৈত্যটি সহস্র কবচ লাভ করেছিল। তার সঙ্গে সহস্র কবচ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তাকে কেউ বধ করতে পারবে না। শিবের বরে বলীয়ান হয়ে দৈত্য ধরাকে সরা জ্ঞান করতো। সহস্রকবচ দৈত্যের উৎপাতে

দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ভগবান বিষ্ণুর স্মরণাপন্ন হন। দেবতাদের রক্ষার জন্যে ভগবান বিষ্ণু নর ও নারায়ণ দুই ভাই হয়ে ধরায় অবতীর্ণ হন এবং বদরিকাশ্রমে তপস্যায় বসেন। সহস্রকবচ দৈত্য নর ও নারায়ণ দুই ভায়ের কথা শুনে বদরিকাশ্রমে ছুটে এসে তাঁদের উপর আক্রমণ সুরু করে। নর, নারায়ণ ও দৈত্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। নর ও নারায়ণ দুই ভাই সহস্রকবচ দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তার প্রতিটি কবচ বিনষ্ট করে তাকে বধ করেন। তদবধি ভগবান বিষ্ণু, নর ও নারায়ণ দুই ভাই রূপে ধর্মরক্ষার জন্যে এবং সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে বদরিকাশ্রমে বিরাজিত।

কৃষ্ণদাস গোঁসাই এর গলা শুনে ফিরে তাকালাম। তিনি আবেগ ভরা কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছেন,

"অগুরু চন্দন হইতাম তুয়া অঙ্গে মাখাইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায়।"

গান থামিয়ে গোঁসাইজী আমায় দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, দেবতাকে যতই কাছে টানি না কেন, যতই প্রেমালিঙ্গনে বাঁধি না কেন, তাতে প্রাণ জুড়ায় না, দেবতার অঙ্গলাভের পিপাসা মেটে না। আমি চাই দেবতার অঙ্গে মিশে যেতে। সাধ হয় শরীরী জীব না হয়ে যদি শীতল সুগন্ধি অগুরু চন্দন লেপ মাত্র হতাম, তবে দেবতার অঙ্গে লেপ হয়ে মিশে থাকতাম। কিন্তু তাতেও বৈষ্ণবের পিপাসা বুঝি মেটে না। তাতেও দেবতার দেহের বাইরে লেগে থাকতে হয়। আমার ইচ্ছা তা নয়। আমি চাই, দেবতার দেহশ্রম জলরূপ বিন্দুর সঙ্গে অগুরু চন্দন হয়ে মিলে মিশে এক হয়ে আবার যদি স্বেদ বিন্দু হয়ে দেবতার পায়ে পড়তে পারি তবে বুঝি আমার পিপাসা মেটে। আমাদের প্রেমই সর্বস্ব। 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম কহনে না যায়।' থামলেন গোঁসাইজী।

মন্দিরের মধ্যে ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে কৃষ্ণদাস গোঁসাইকে আর দেখতে পেলাম না। কোথায় ছিটকে পড়েছেন তিনি। গোঁসাইজীর কথাগুলো

তখনো কানের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছিল। প্রেমের একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে। এই আকর্ষণী শক্তিতে জীবাত্মা চায় পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে। অর্থাৎ প্রতিটি বৈষ্ণবের হৃদয় প্রেমের বিনিময়ে অন্য হৃদয়ের সঙ্গে মিলনের কামনা করে তুইয়ে মিলেমিশে এক হতে চায়। এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের সঙ্গে মিলনের এই ক্রন্দন বৈষ্ণবদের চিরন্তন। 'If anyman love, he knoweth what is the cry of this love.'

মন্দিরের চাপরাশি আমাদের বাইরে যাওয়ার জন্যে খুব তাড়া দিতে লাগলো। বাধ্য হয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে হলো, বাইরে আসার আগে বদরিনারায়ণজীর কাছে করজোড়ে আমার শেষ প্রার্থনা জানিয়ে বিদায় নিলাম।

বদরিনারায়ণজীর জয় ধ্বনি দিতে দিতে মূল মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের সামনে। পাণ্ডাঠাকুর আমাদের লক্ষ্মীদেবীর পূজা করালেন। লক্ষ্মীদেবীর পূজার পর সুরু হলো মন্দির প্রদক্ষিণের পালা। লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের পাশে বদরিনারায়ণের পূজারী রাওলসাহেবের কাছারী বাড়ী। এখানে বদরিনারায়ণের প্রণামী অর্থ সংগ্রহ করা হয়। বদরিনারায়ণজীর তিন প্রকার প্রণামী অর্থাৎ ভেটের বিধি আছে। তীর্থযাত্রীরা ইচ্ছা ও সামর্থানুযায়ী আটকা ভোগ, থলিভেট ও গদিভেট প্রভৃতি ভেট এই দপ্তরে জমা দিয়ে থাকে। ভেটগুলোর বিধিব্যবস্থা এইরূপ—

আটকা ভোগ—যদি কোন যাত্রী বদরিনারায়ণের প্রসাদ নিতে ইচ্ছা করে তখন তাকে আটকা ভোগের প্রণামী জমা দিতে হয়। যে যাত্রী যতটাকা প্রণামী দেয় সে তার অর্দ্ধেক মূল্যের নারায়ণের অন্নপ্রসাদ পায়। এই প্রণামীর টাকা নারায়ণের ভোগ হওয়ার পূর্বে জমা দিতে হয়।

থলি ভেট—যাত্রীরা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী সাধ্যমত প্রণামীর টাকা একটি থালায় করে নারায়ণের মন্দিরে নিয়ে যায় এবং বদরিনারায়ণের কাছে সেই টাকা উৎসর্গ করে দেবতার সামনে রক্ষিত সিন্ধুকে ঢেলে দেয়।

গদি ভেট—এই প্রণামী বদরিনারায়ণের পূজারী রাওলসাহেবের সম্মানার্থে রাওলসাহেবকে দেওয়া হয়।

মন্দির পরিক্রমা শেষ করে আমরা মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাজারে একটা দোকানে কিছু জলযোগ করে বদরিকাশ্রমের দ্রষ্টব্য বস্তুগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়ি। শোনা যায়, আজও ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ নানা তীর্থ বিরাজিত এই রম্য ভূবৈকুণ্ঠ বদরিকাশ্রমে লোক চক্ষের অগোচরে অবস্থান করে বিষ্ণু নারায়ণের তপস্যা করেন। বহু জন্মের সুকৃতি থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষেও বদরিনারায়ণের দর্শন ঘটে। বদরীনারায়ণজীর দর্শন খুবই দুর্লভ। যাত্রীরা বদরিকাশ্রমে এসে প্রথমে বদরিনারায়ণকে দর্শন ও পূজা করে ঋষিগঙ্গা, কূর্মধারা, প্রহ্লাদধারা, তপ্তকুণ্ড ও নারদকুণ্ড প্রভৃতি পঞ্চতীর্থে স্নান, পঞ্চশিলা, আদিকেদার লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শ ও পূজাদি করে থাকে। তীর্থ-পাণ্ডারা ধর্মার্থী যাত্রীদের তীর্থের ক্রিয়াকর্মের সাহায্য করে থাকেন যার ফলে যাত্রীদের বিশেষ কোন অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় না।

নারদাদি পঞ্চশিলাও খুব প্রসিদ্ধ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। এই পঞ্চশিলার মধ্যেই দেবতা বদরিনারায়ণের আসন অবস্থিত। যে ব্যক্তি বদরিকাশ্রমে এসে পঞ্চশিলা দর্শন, স্পর্শ ও পূজা করেন, অন্তিমকালে সেই ব্যক্তি নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হন। পঞ্চশিলা যথা—

নারদ শিলা— "নারদীয়া যত্র শিলা বিষ্ণুলোকে প্রদায়িনী,
শ্রুয়ন্তে যত্র নির্ঘোষা বেদানাং সুমুনী রিতঃ।"

এই পবিত্র স্থানে মুনিবর নারদ কর্তৃক উচ্চারিত বেদধ্বনি সর্বদা শ্রুত হয়। এই স্থানে নারদকুণ্ড অবস্থিত। মুনিবর নারদ এই পবিত্র স্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। তাই তাঁর নামানুসারে উক্ত শিলা ও কুণ্ডের নামকরণ হয়েছে। অনেক আবার সেই জন্যে বদরিকাশ্রমকে নারদীয় ক্ষেত্র ও বলে থাকে।

বারাহী শিলা—" শিলা যত্র চ বারাহী পাপ হা সর্ব কামদা।
তত্র স্নাত্বা তথা জপ্তা ফলানন্ত্যবং লভেন্নর॥"

বিষ্ণু নারায়ণ এই স্থানে তপস্যা করে বরাহ মূর্তি ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। তদবধি এই স্থান পবিত্র তীর্থ রূপে খ্যাত হয়। এই স্থানে অলকানন্দার মধ্যস্থিত বরাহ কুণ্ড আছে। এখানে স্নান ও জপ করলে মানুষ অনন্ত ফলভোগী হয়।

নারসিংহশিলা— "নারসিংহ শিলা যত্র সর্ব পাপ প্রণাশিনী।
কুণ্ডং তত্র সমাখ্যাতং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কম।"

এইস্থানে নারসিংহ কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের জলে স্নান করলে মানুষ পাপতাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু চার যুগ ধরে এই স্থানে অবস্থান করছেন।

গরুড়শিলা— "গারুড়ী চ তথাপ্রোক্তা গরুড়েন মহাত্মনা।
প্রাপ্তুং হরের্বাহনত্বং সখ্যং চ পরমং হরেঃ॥"

গরুড় এই স্থানে ভগবান বিষ্ণুর বাহনত্ব সখ্য লাভের জন্যে বহু কাল যাবৎ তপস্যা করেছিলেন। তাই গরুড়ের নামানুসারে শিলার নাম হয়েছে গরুড় শিলা।

সর্বশেষ হলো মার্কণ্ডেয় শিলা—

" মার্কণ্ডেয়া শিলা তত্র সর্ব্বলোকেষু দুর্ল্লভা।
যা স্পৃষ্টাপি নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপপ্রমুচ্যতে।"

এই শিলা স্পর্শ করা মাত্র মানুষ জন্মজন্মার্জিত পাপরাশি থেকে মুক্তি লাভ করে। এই স্থান মুনিপ্রবর মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যার স্থান, মুনির নামানুসারে এই শিলার নামকরণ হয়েছে মার্কণ্ডেয় শিলা।

বদরিকাশ্রমের তীর্থরাজির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তীর্থ হলো ব্রহ্মকপালতীর্থ। ঋষিগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থলে এই তীর্থ অবস্থিত। এখানে ঋষিগঙ্গা ও অলকানন্দার মিলন সংঘটিত হয়েছে বলে অনেকে বদরিকাশ্রমকে ঋষিপ্রয়াগও বলে থাকে। তীর্থযাত্রীরা ব্রহ্মকপাল তীর্থে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও তর্পণাদি ক্রিয়া-কর্ম করে থাকে।

ব্রহ্মকপাল তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে। এক সময় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজ মানস কন্যা বাগ্দেবী সরস্বতীর রূপ দর্শনে বিমোহিত হয়ে কামউন্মত্ত অবস্থায় আত্মজার পশ্চাৎ ধাবন করেন। দেবাদিদেব মহাদেব সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এই উন্মত্ত কুৎসিত কামপ্রবৃত্তি সহ্য করতে না পেরে সৃষ্টিকর্তার একটি মুণ্ড ছেদন করেন। যে স্থানে ব্রহ্মার ছিন্নমুণ্ড পতিত হয়েছিল সেই স্থানটি বিখ্যাত ব্রহ্মার কপাল বা ব্রহ্ম কপালতীর্থে পরিণত হয়। পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দানের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো এই ব্রহ্মকপাল তীর্থ। একবার এই পবিত্রস্থানে পিণ্ডদান করলে আর কোথাও পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করতে হয় না।

ব্রহ্মকপাল ব্যতীত বদরিকাশ্রমের আশেপাশে আরো অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। ঋষিগঙ্গার দক্ষিণে পাহাড়ের গায়ে উর্বশীদেবীর মন্দির, বদরিকাশ্রমের পশ্চাতে ঋষিগঙ্গা পাহাড়ের উপর 'চরণ-পাদুকা', অলকানন্দার বামদিকে নর পর্বতে 'শেষ-নেত্র'। প্রবাদ নারায়ণের দৃষ্টি এখানে সদাজাগ্রত। বদরিকাশ্রম থেকে এক মাইল দূরে মানাগ্রাম যাওয়ার পথে বামদিকে 'মাতামূর্তি' দেবীর মন্দির পড়ে। বদরিনাথ থেকে মানাগ্রামের দূরত্ব দু'মাইল। এই পথে মানা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পশ্চিম তিব্বতস্থিত হিমতীর্থ কৈলাস-মানস সরোবর যাওয়া যায়। পথ দুর্গম।

বদরিনাথের মন্দির থেকে তিন মাইল দূরে মাতামূর্তির পথে বসুধারা নামে একটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে। বসুধারার আরো উপরে গেলে মুচুকুন্দাশ্রম ও গুহা; ব্যাসাশ্রম, সতপন্থ বা সত্যপথ, সত্যপথের আরো তিন মাইল দূরে স্বর্গারোহিণী প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। স্বর্গারোহিণী থেকেই একমাত্র পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ কুকুরের সঙ্গে স্বর্গ আরোহণে সক্ষম হয়েছিলেন। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যে পথে স্বর্গারোহণ করেছিলেন, সেই পথকে বলা হয় স্বর্গারোহিণী। পথ খুবই দুর্গম। এদিকের পথে থাকার কোন চটি নেই কিংবা পথে খাদ্যসামগ্রী

পাওয়া যায় না। এই পথ দর্শন করতে আসতে হলে বদরিনাথ থেকেই উপযুক্ত পথপ্রদর্শক, তাঁবু ও খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে আনতে হয়।

বদরিকাশ্রমের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখা শেষ করে বাসায় ফিরে এসে পাণ্ডাঠাকুরকে জানিয়ে দিলাম, আজই আমরা দেশাভিমুখে রওনা হব। তিনি আমাদের জন্যে বদরিনারায়ণের মহাপ্রসাদের বন্দোবস্ত করেছিলেন। দুপুরে নারায়ণের মহাপ্রসাদ পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করে একটু বিশ্রাম করছি, এমন সময় পাণ্ডাঠাকুর গঙ্গাজল, বদরিনারায়ণের পূজার ফুল, ব্রহ্মকমল ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলেন। প্রথমে পাণ্ডাঠাকুরের খাতায় আমাদের নাম ধাম ইত্যাদি লিখে নিলেন। তারপর তিনি মধুর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে একে একে আমাদের তিনজনকেই সুফল করালেন।

সকল হিমতীর্থ কেদার-বদরি যাত্রীকেই ফেরার সময় নিজ নিজ তীর্থপাণ্ডাকে দিয়ে তীর্থের সুফল করাতে হয়। তা না হলে তীর্থপরিক্রমার ফলপ্রাপ্তি হয় না। সুফলান্তে পাণ্ডাঠাকুরের হাতে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়ে পাণ্ডার দেওয়া আশীর্বাদ ও তীর্থের স্মৃতির বোঝা নিয়ে বদরিনারায়ণজীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রায় দু'টোর সময় আমরা তিনজনে একসঙ্গেই বদরিকাশ্রম থেকে অবতরণ সুরু করে দিলাম।

এবার ফেরার পালা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন ঘর থেকে বার হয়েছিলাম—আত্মীয়, স্বজন সকলের অশ্রু-সজল চোখের সামনে, আজ তা সফল হয়েছে। হিমতীর্থ কেদার-বদরি পরিক্রমা আমাদের শেষ হয়েছে। হিমালয়ের যে দুর্নিবার আকর্ষণ আমায় অবিরত টেনেছে—আমি তা আকণ্ঠ উপভোগ করেছি। দিনরাত্রি দু'চোখ ভরে দেখেছি গিরিরাজ হিমালয়ের অপূর্ব সুন্দর রূপ। দু'কান ভরে শুনেছি কলস্বনা জাহ্নবী, অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর কুলুকুলু ধ্বনি—প্রাণ ভরে নিশ্বাসে নিয়েছি অজস্র ফুলের অফুরন্ত গন্ধ।

"যাবার দিনে এই কথাটি বলতে যেন পাই,
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।"

যেদিন বদরিনাথ থেকে বিদায় নিলাম—সেদিন কেন জানি না মনে হলো, পথ বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। অবিরাম চলতে চলতে মাঝে মাঝে শ্রান্তিবোধ হয়েছে, হয়তো ভেবেছি পথ ফুরোলে বাঁচি, কিন্তু আজ যখন সত্যিই পথ ফুরোলো তখন পথের জন্যেই মনটা উদাস হয়ে উঠলো। পঞ্চা ও বিমলকে অনেকখানি উৎসাহিত দেখলাম বটে, কিন্তু মনে হলো ওরাও যেন ঠিক আনন্দিত হতে পারেনি। কি মোহ যে এই হিমালয়ের পার্বত্য পথের তা একমাত্র যাত্রিকরাই জানে।

আনমনাভাবেই পথ চলছিলাম। কখন যে আকাশ ঘিরে মেঘ জমে উঠেছে খেয়ালও করিনি। হঠাৎ নামলো বৃষ্টি। সামান্যক্ষণ। এক পসলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। যাত্রীরা বিকেলের দিকে মনোমত চটিতে এসে যে যার আশ্রয় নিলো। আমরা তিনজনই কেবল চলেছি এগিয়ে। যতটা পারি এগিয়ে থাকা ভাল। চলতে চলতে বিকেল কেটে গেল। নেমে এলো সন্ধ্যা। ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক। সেই অন্ধকারের মধ্যে টর্চের আলোয় পথ চিনে রাত আটটায় চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলাম ঘাট চটিতে। এখানে সব চটি আগে থাকতেই যাত্রীতে ভর্তি হয়ে আছে। এখানে আশ্রয় না পেলে আমাদের খুবই মুস্কিলে পড়তে হবে। তাই রাতের আশ্রয়ের জন্যে এ চটি সে চটি করে খুঁজতে লাগলাম। কোন চটিতে আশ্রয় মিললো না, শেষে একটা পুরী-ওয়ালার দোকানে কোনরকমে রাতটুকুর জন্যে আশ্রয় পাওয়া গেল। এছাড়া আর অন্য কোন উপায়ও ছিল না। দোকান থেকে গরম পুরী কিনে খাওয়াদাওয়া শেষ করে রাত দশটার সময় শুয়ে পড়লাম। সারাদিন দোকানের চুল্লীতে আগুন জ্বলায় রাতটা মৃদু গরমে বেশ আরাম করেই কাটলো।

ভোর হতেই আবার পিঠঝুলি কাঁধে তুলে নিয়ে নেমে পড়ি পথে। পথে পা দেওয়া মাত্র বিমল আর পঞ্চা আমায় পিছনে ফেলে ফড়িংয়ের মত উড়ে গেল অনেকটা পথ। আমি শুধু একা লাঠির উপর ভর দিয়ে মন্থর গতিতে ফিরে চলেছি। আগের মত পথ চলায় আর উদ্যম নেই। কারণ হিমতীর্থ কেদার-বদরির সেই লৌহ আকর্ষণ আর নেই। এখন কেবল স্মৃতির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ফিরছি—এ যেন ঘরে ফিরব বলেই ফেরা। এত পরিশ্রম, এত কষ্ট করে হিমালয়ের দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে হিমাঞ্চলের তীর্থে তীর্থে ঘুরে শেষে কি পেলাম? ফেরার পথে দুর্বল মনে বার বার সেই প্রশ্নই জেগে ওঠে। মানুষের দুর্বল মনের অহেতুক প্রশ্ন ওটা। হিমালয় অথবা হিমাঞ্চলের তীর্থ পরিব্রাজকের কাছে, কি পেলাম আর কি পেলাম না—এই টাই একমাত্র বড় কথা নয়; সত্য হলো—

"যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পাইনি বড় সেই নয়।"

বদরিনাথের যাত্রীরা মহানন্দে বদরিনাথজীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে সামনের চড়াই পথে এগিয়ে চলেছে আর আমরা চলেছি নীচের পথে। ঘাট চটির এক মাইলের পর বলদেও চটি। এই এক মাইল পথ চলতে অনেকখানি সময় ব্যয়িত হলো। পথে চলার এই শৈথিল্যের একমাত্র কারণ হলো হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তন। মন চায় না ঘরে ফিরে যেতে।

পথে নতুন যাত্রীদের দেখে মনে হয় কি বিপুল আগ্রহ আর অসীম ধৈর্য নিয়ে পার্বত্য চড়াই উৎরাই পথ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে চলেছে বদরিকাশ্রমে। পথের কোন কষ্টই যেন তাদের কষ্ট নয়। উৎরাই পথের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হলে বদরিকাশ্রমের যাত্রীরা জিজ্ঞাসা করে, ভাইয়া, অউর কিতনা দূর?

যাত্রীদের কথাবার্তায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা শেষ সীমারেখায় পৌঁছনোর জন্যে কত উদ্বিগ্ন, কত চিন্তিত। সীমারেখা দূর হলেও এই সব যাত্রীদের পথের দূরত্ব সঠিক বলতে নেই।

পথে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগ অতিক্রম করে দু'মাইল চড়াই ঠেলে এসে হাজির হলাম যোশীমঠে।

যাওয়ার পথে যোশীমঠ দেখা হয়নি তাই ফেরার পথে ভিন্ন দিক দিয়ে না গিয়ে পুনরায় এসেছি যোশীমঠে—অদেখাকে দেখে যাব বলে। যোশীমঠের একটা দোকানে বিমলের সঙ্গে দেখা হলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, পঞ্চা কোথায়?

জানি না। ওর সঙ্গে অনেক আগে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে। ভেবেছিলাম যোশীমঠে পৌঁছে বুঝি ওর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তা হয়নি।

বিমলের কথা শুনে মনে মনে ভাবলাম, সে নিশ্চয়ই আমাদের দেখা না পেয়ে সোজা পিপুলকুঠির দিকে চলে গিয়েছে। আমরা আর কালবিলম্ব না করে দোকানে পিঠঝুলি দু'টো রেখে পাহাড়ের উপর অবস্থিত যোশীমঠ দেখতে গেলাম। হিমালয়ের কোলে প্রকৃতির সুন্দরতম পরিবেশের মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত এই মঠ—আজও হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শঙ্করাচার্য বৈদিক ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে উত্তরে হিমালয়ে জ্যোর্তিমঠ বা যোশীমঠ, দক্ষিণে রামেশ্বরে শৃঙ্গেরীমঠ, পূর্বে শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় শারদা মঠ নামে ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করে যান। শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি মঠ এক একটি তীর্থ বিশেষ।

পুণ্যগিরীদেবীর মন্দির, শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ, জ্যোতিগুহা ও মঠবাড়ী প্রভৃতি যোশীমঠের উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। মঠবাড়ীতে আজও ব্রহ্মচারী ছাত্ররা বসবাস করে। এখানকার ব্রহ্মচারীদের উপাধি হলো আনন্দ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যোশীমঠ দেখা শেষ করে নীচে নেমে এলাম। বদরিনাথ যাবার সময় রাতের অন্ধকারে যে যোশীমঠ দেখেছিলাম এ সে নয়, যেন অন্য যোশীমঠ। কলকোলাহল মুখরিত পার্বত্য শহর, এখানে লোকের বেশ ঘন বসতি আছে। শঙ্করাচার্যের সময় হিমালয়ের এই অঞ্চল মোটেই উন্নত ছিল না, বর্তমানে এদিকে

খুব বেশী রকমের উন্নতি ঘটেছে। এখানে বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, থানা, হাসপাতাল, পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, ধর্মশালা, চটি, ডাক ও তারঘর, গ্রাম্য-পঞ্চায়েত ইত্যাদি সবই আছে। তাছাড়া যোশীমঠ অঞ্চলের পরিবেশটিও সাধু-সন্ন্যাসীদের তপস্যার বিশেষ অনুকূল।

ভগবান শঙ্করাচার্যের তপঃসিদ্ধ যোশীমঠ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলেছি। পথে চলতে চলতে দেখেছি বেশ বলিষ্ঠ, কর্মঠ গাড়োয়ালী নারী আর পুরুষকে। এ-অঞ্চলে মেয়েদের কোন পর্দা নেই। তারা ঘরে বাইরে যাবতীয় কাজ করে থাকে। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা বেশী কাজ করে। তাদের কাজের শেষ নেই। দিনরাত কোন না কোন কাজ করে চলেছে মেয়েরা। এরা অলস অকর্মণ্যভাবে বসে সময় নষ্ট করতে চায় না। রূপের সঙ্গে পার্বত্য মেয়েদের আছে গুণ। সাজ-পোষাকে অপরিষ্কার হলেও গাড়োয়ালের জোয়ান পুরুষ ও যুবতী নারীদের রূপের চটক যে কোন যাত্রী কিংবা পর্যটকদের চোখে পড়ার মত। প্রকৃতি নিজের খেয়াল খুসিতে যেন ওদের দেহসৌন্দর্য গড়ে তুলেছে।

পার্বত্য গাড়োয়ালবাসীরা দরিদ্র হলেও নিজেদের সৌন্দর্যে আর খুসির আনন্দে সদাই ডগমগ। জোয়ান পুরুষ আর যুবতী নারীরা দিনের শেষে কাজের পর একজায়গায় সমবেত হয়। নারী-পুরুষ একসঙ্গে নিজেদের তৈরী মদ 'ছাঙ' খায়, মনের খুসিতে গান গায়; দল বেঁধে নৃত্য করে। মন্দাকিনী আর অলকানন্দার স্রোতের মত ওদের প্রাণেও আনন্দের প্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে বয়ে চলেছে। সে কি স্ফূর্তি আর সে কি আনন্দ উচ্ছ্বাস। দারিদ্র্য ওদের পঙ্গু করার চেষ্টা করলেও ওদের সৌন্দর্য আর আনন্দকে এতটুকু ম্লান করতে পারে নি।

পার্বত্য গাড়োয়ালীদের প্রকৃতি খুবই সরল। তীর্থ যাত্রীদের ওরা যথেষ্ট সেবা করে। হিমালয়ের কোলে জন্ম বলে এক ঐশিক প্রভাবে ওরা সবাই প্রভাবান্বিত। হিমালয়ের প্রতিটি অধিবাসী দেবতাত্মা হিমালয়ের পূজা করে, তিথি নক্ষত্র হিসাব করে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে

উৎসব করে। মহান্ হিমালয়, অধিবাসীদের প্রাণের সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। হিমালয় ওদের কলিজা, সাধু-সন্ন্যাসীদের তপোভূমি, গৃহী লোকেদের তীর্থ। তাই হিমালয়ের প্রতিটি পথ যুগ যুগ ধরে তীর্থের পথ হয়ে আকর্ষণ করেছে সকলকে। ধর্মার্থী, পুণ্যকামী তীর্থ যাত্রীদের চোখে হিমালয়ের প্রতিটি কঙ্কর প্রতিফলিত হয় শঙ্কর মূর্তিতে। হিমালয় পরিভ্রমণে এসে জীবত্মার প্রাণ জেগে ওঠে শিবাত্মার চেতনায়।

দেবতাত্মা হিমালয়ের কথা, হিমতীর্থের কথা চিন্তা করতে করতে আমরা দু'জনে কুমার চটিতে পৌঁছে গেলাম। পঞ্চা বোধ হয় এতক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে পিপুলকুঠি চটিতে। বেলা হওয়ার জন্যে আমরা এই চটিতে দিবাহার করে একটু বিশ্রামের পর আবার হাঁটা সুরু করি।

পিপুলকুঠি পৌঁছতে এখনো তেরো-চৌদ্দ মাইল পথ বাকি। বদরিনাথ যাত্রীদের সবাইকে পিপুলকুঠি পর্যন্ত একই পথে হেঁটে ফিরতে হয়। পিপুলকুঠিতে ফিরে এসে হিমতীর্থ কেদার-বদরির যাত্রীদের হাঁটার পর্ব শেষ হয়। তীর্থ দর্শনে যাওয়ার সময় যাত্রীদের যে উদ্যম থাকে ফেরার সময় সে উদ্যম থাকে না। পায়ের জোরও শিথিল হয়ে পড়ে। তখন কোন রকমে যাত্রীরা ফিরতে পারলেই বাঁচে।

আমরা চলেছি মন্থর গতিতে। পিপুলকুঠি পৌছতে যখন আর মাত্র আধমাইল পথ বাকি এমন সময় হঠাৎ আকাশ কাল মেঘে ছেয়ে গেল। উঠলো ভীষণ ঝড়, সুরু হ'ল মেঘের গুরু গুরু গর্জন। এ-যেন রুদ্রদেবের প্রলয়ঙ্কর মূর্তি, মুহূর্তে বুঝি লয় হয়ে যায় পৃথিবী। জানিনা তাঁর এই ভয়াল ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্যের কখন শেষ হবে। রুদ্রদেবের প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখে শংকিত হয়ে ওঠে অন্তরাত্মা। কম্পিত হৃদয়ে শিবজীর নাম স্মরণ করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আর মাত্র দু'ফার্লং পথ বাকি এমন সময় দেখি, পঞ্চা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, তুই আবার কেন এই দুর্যোগে পথে বেরিয়েছিস ?

তোদের খোঁজে।

তা বেশ করেছিস্। এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল। তা না হলে এখুনি স্থুরু হবে প্রবল বর্ষণ!

বর্ষণ হওয়া অত সহজ নয়। দেখিস, পিপুলকুঠিতে না পৌঁছনো অবধি কিছুই হবে না। শিবজী আমাদের সহায়। তিনি যতই উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করুন না কেন, ভক্তকে তিনি বিনষ্ট করতে পারেন না। শিবভক্তকে শিব পিনাক হস্তে সদাই রক্ষা করে থাকেন।

হিমালয়ের হিমতীর্থ ঘুরে ঘুরে দেবতার প্রতি পঞ্চার অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। দেবতার সত্বায় বিশ্বাস করে ও এখন আপদ-বিপদের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। পথে যতই আপদ-বিপদ আস্থক না কেন, ওর দৃঢ় বিশ্বাস, মুক্ত হবেই, রক্ষা পাবেই। বিশ্বাসই সব, বিশ্বাসের কাছে কোন জিনিসই টেঁকে না। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হয়েছিল, কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিল। রামভক্ত হনুমানের আর সেতু বাঁধার দরকার হয়নি। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে ভক্ত একবার যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, তা ঠিকই হয়। পিপুল-কুঠিতে নিরাপদে পৌঁছে ওর কথা চিন্তা করতে লাগলাম, আশ্চর্য! ও যে বলেছিল পিপুলকুঠিতে না পৌঁছনো পর্য্যন্ত কিছুই হবে না, হলোও না কিছু। ভক্তের কথা ভগবান রক্ষা করেছেন।

পিপুলকুঠি চটিতে পা দিতে না দিতেই স্থুরু হলো প্রবল বর্ষণ। অনেকক্ষণ ধরে ঝড় আর বৃষ্টির দ্বৈতক্রীড়া চলতে লাগলো। আর ভয় নেই, পথ হাঁটার শেষ হয়েছে। এই পিপুলকুঠিতে বদরিনাথ যাত্রীরা ফিরে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচে। তীর্থ দর্শনে যাওয়ায় উদ্যম আছে, কিন্তু তীর্থ দর্শন করে ফেরাটাই যাত্রীদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তখন সবাই ঘরমুখী। কে কত তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছতে পারে। সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা অবশ্য আলাদা তাদের ঘর আর বাহির দুই-ই সমান। কথা হলো গৃহীদের নিয়ে। চটিতে আমাদের সঙ্গে আলাপ

হলো এক অশীতিপর বৃদ্ধ যাত্রীর। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে বেরিয়েছিলেন শুধু বদরিনারায়ণ দর্শনে। মাঝ পথ থেকে তারা সবাই ফিরে আসছেন। পুত্র আর পুত্রবধূর সঙ্গে পরিচয় হতে তারা আপশোস করে বলতে লাগলেন, তীর্থ দর্শন ভাগ্যের কথা, ভাগ্যে না থাকলে তীর্থ, তীর্থদেবতার দর্শন পাওয়া যায় না। পথে নামলেও, পথ থেকেই আবার ফিরতে হয়। যেমন আমরা মাঝপথ থেকে ফিরছি।

ব্যাপার কি ? কেন মাঝপথ থেকে ফিরতে হচ্ছে আপনাদের ?

পুত্রবধূ উত্তর দিলেন, আগেই তো উনি বললেন, তীর্থ দর্শন ভাগ্যের কথা। শ্বশুর মহাশয়ের তাগিদে আমাদের সকলকেই ফিরতে হচ্ছে। কারণ নাতির জন্যে শ্বশুর মহাশয়ের মন বড় উতলা হয়েছে। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে শ্বশুর মহাশয় প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। মনটা আমাদের সকলেরই ভেঙ্গে পড়লো।

আমি বললাম, আপনার শ্বশুর অশীতিপর বয়সের হলে কি হবে, উনি ঘোর বদ্ধজীব। বদ্ধজীবের ভগবানের চেয়ে বিষয়ে আসক্তি বেশী। হাত পা বদ্ধজীবেদের বাঁধা। তারা পরকালের চিন্তা তো করেই না, ঈশ্বরের চিন্তাও করে না। তা না হলে এই ত্রিলোক-দুর্লভ বদরিনাথ তীর্থে এসে তীর্থ পরিক্রমা সম্পূর্ণ না করে উনিই বা ফিরে যাবেন কেন ?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বধূটি বললেন, সবই ভাগ্য। জীবনে এই প্রথম তীর্থের পথে পা দিয়েছিলাম, বিধি তাতেও বাদ সাধলেন। আর কি জীবনে এই দুর্লভ তীর্থদর্শন হবে ?

মনে জোর থাকলে, বিশ্বাস থাকলে নিশ্চয়ই আবার আপনার তীর্থ দর্শন হবে।

বললাম বটে কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, দশচক্রে পড়ে ভগবানকেও ভূত হতে হয়েছিল। বধূটিরও তীর্থ দর্শনের প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও শ্বশুর মহাশয়ের জন্যে ফিরতে হলো। সত্যি এ আপশোসের কথা।

বৃষ্টি থামতেই আমরা ঐ রাত্রেই বাসের বুকিং অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। টিকিট পেলে কাল সকালেই কোটদ্বারের দিকে রওনা হব।

টিকিট বিক্রেতার কাছে শুনলাম, কোটদ্বারের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে, তবে সকালে আরো দু'একটা বাস বেশী পাঠানো হবে। তার টিকিট সকালেই যাত্রীদের কাছে বিক্রি করা হবে। শেষ কথা টুকু শুনে একটু আশ্বস্ত হলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোটদ্বারগামী বাস রুদ্রপ্রয়াগে কতক্ষণ থামে ?

সময়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। কেন, রুদ্রপ্রয়াগে কোন কাজ আছে বুঝি ?

হ্যাঁ। ওখানে কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালায় আমাদের কিছু জিনিস জমা আছে।

এক কাজ করুন, সকালের প্রথম বাসে আপনাদের একজন চলে যান রুদ্রপ্রয়াগে। ধর্মশালা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে তিনি রুদ্রপ্রয়াগের বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করবেন। পরের বাসে অপর জন গিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে যিনি অপেক্ষা করবেন তাকে তুলে নেবেন।

যুক্তিটা মন্দ নয়। পঞ্চা আগের বাসে যেতে রাজি হলো। ওর সম্মতি পেয়ে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত একটা টিকিট কেটে নিলাম। বিমলও দেখি শ্রীনগর পর্যন্ত একটা টিকিট কেটে নিলো। ও ফিরবে হরিদ্বার হয়ে। আমরা ফিরব কোটদ্বার হয়ে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়ার পর্ব শেষ করে সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত দেহটাকে নিদ্রাদেবীর কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

রুদ্রপ্রয়াগের বাস ছাড়বে ভোর পাঁচটায়। তাই তাড়াতাড়ি ওদের ঘুম থেকে তুলে রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে বললাম। বিমল নিজের পিঠঝুলিটা গুছিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ-শ্রীনগরগামী বাসে তুলে রেখে এলো। পঞ্চার পিঠঝুলি রইলো আমার কাছে। বাস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে, বিমল আর পঞ্চা একটা দোকানে কোনরকমে একটু চা পান করে গিয়ে

বসলো বাসে। বাস ছেড়ে দিলো। আমিই কেবল একলা পড়ে রইলাম পরের বাসে যাব বলে। •

পরের বাস ছাড়বে একটু দেরীতে। পিপুলকুঠি থেকে কোটদ্বারের ভাড়া শ্রেণীভেদে—সতেরো টাকা ন' আনা ও বারো টাকা ন' আনা এবং দূরত্ব হলো একশ সাড়ে উনষাট মাইল। এক ফাঁকে গিয়ে কোটদ্বারের একটা টিকিট কিনে আনলাম। দেখি সব যাত্রীই টিকিটের নম্বর অনুযায়ী যে যার নির্দিষ্ট বাসে গিয়ে বসছে, আমিও পিঠঝুলিগুলো নিয়ে আমার টিকিট নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট বাসে গিয়ে উঠে বসলাম। আমি যে বাসের যাত্রী সেই বাসটির নাম 'গাড়োয়াল ফ্লাইং-বার্ড।' নামটি বেশ জুতসই।

গাড়োয়াল ফ্লাইং বার্ডের ড্রাইভার সাহেবকে পঞ্চার কথা বললাম। সব শুনে ড্রাইভার সাহেব বললে, ঠিক আছে। আপনার বন্ধুকে রুদ্র-প্রয়াগ থেকে এই বাসেই তুলে নেবো। বেলা আটটার সময় পিপুলকুঠি থেকে কোটদ্বারগামী বাস এক এক করে ছেড়ে দিলো। বাস ছাড়ার সময় যাত্রীর দল মহোল্লাসে বদরিনাথজী ও কেদারনাথজীর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো।

ন' মাইল পথ অতিক্রম করে বাস চামোলীতে এসে থামলো। এখানে নীচের বাসগুলোকে পাস করানো হবে। নীচের বাস না আসা পর্যন্ত আমাদের বাসগুলোর যাওয়ার হুকুম নেই। বেলা এগারোটার সময় নীচ থেকে বাসগুলো সব একে একে এসে চামোলীতে পৌঁছে গেল। আমাদের বাসগুলো আবার এক এক করে ছুটে চললো নীচের দিকে।

চামোলী থেকে সাত মাইল দূরে নন্দপ্রয়াগ। কেদার-বদরির পথে নন্দপ্রয়াগ হলো পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম প্রয়াগ। বাস এখানে এসে থামে কিছুক্ষণ। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে নন্দ নদী আর অলকানন্দার সঙ্গম স্থান দর্শন করে। সঙ্গম স্থানের উপর অবস্থিত শ্রীশ্রীচণ্ডিকা দেবী, নন্দ, যশোদা, কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতির মন্দিরগুলো দূর থেকে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়।

শোনা যায়, পুরাকালে নন্দ নামে এক ধার্মিক রাজা এখানে মহাদান দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করেছিলেন। তদবধি, নন্দরাজার নামানুসারে এখানকার স্থানের নাম, নদীর নাম ও নদীর সঙ্গমের নাম হয়েছে নন্দপ্রয়াগ।

নন্দপ্রয়াগের পর বাস এসে থামলো ২,৬০০ ফিট উচ্চে কর্ণপ্রয়াগে। পিণ্ডারগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলের উপর কর্ণপ্রয়াগ শহরটি অবস্থিত। গাঙ্গেয় হিমালয় প্রদেশের অন্তবর্তী পঞ্চপ্রয়াগের সর্বশেষ প্রয়াগ হলো কর্ণপ্রয়াগ। রাজা কর্ণ এখানে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন এবং এই প্রয়াগতীর্থে তিনি সূর্যদেবের দর্শন লাভ করে অভেদ্য কবচাদি বরলাভ করেছিলেন। এখানে কর্ণ, উমাদেবীর মন্দির ও কর্ণকুণ্ড নামে একটি পবিত্র কুণ্ড আছে। রাজা কর্ণের নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়েছে কর্ণপ্রয়াগ। কর্ণপ্রয়াগ হরিদ্বার, বদরিনাথ ও রামনগর পথের সংযোগ স্থান। তিনদিক থেকে তিনটি পথ এসে মিলিত হয়েছে এই স্থানে। উপর ও নীচের বাসগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ে এখানে পাস করানো হয়।

বেলা দেড়টার সময় আমাদের বাসগুলো আবার চলতে সুরু করলো। পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাগরদোলার মত একবার উপর একবার নীচ করতে করতে এসে পৌঁছলো রুদ্র-প্রয়াগে। বাস থামতেই পঞ্চাকে বাসস্ট্যাণ্ডের উপর জিনিস পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বাসে জিনিসপত্র তুলে পঞ্চার টিকিটের জন্যে বুকিং অফিসে গেলাম। কোটদ্বারের টিকিট না পেয়ে নিরাশ হতে হলো। ড্রাইভার সাহেবকে বলতে সে পরামর্শ দিলো, শ্রীনগর পর্যন্ত টিকিট কেটে ভিন্ন বাসে শ্রীনগর যান। ওখানে থেকে আপনাদের ছু'বন্ধুকে আবার এক বাসে নিয়ে নেবো। তথাস্তু! পঞ্চাকে শ্রীনগর পর্যন্ত টিকিট কেটে দিলাম।

আমি গাড়োয়াল ফ্লাইং বার্ডের যাত্রী আর অন্য একটা অজ্ঞাতনামা বাসে গিয়ে উঠলো পঞ্চা। সব বাসই এক এক করে আগে পিছে যাবে। এখানে বাস বেশীক্ষণ না থেমে পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথে এক এক

করে ছুটে চললো শ্রীনগরের দিকে। পাহাড়ের মাথা থেকে নীচের গঙ্গাকে ঠিক যেন প্রকৃতিরাণীর একটি রূপালী চওড়া কোমর বন্ধের মত দেখায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরাণীর সাজ-সজ্জারও পরিবর্তন হয়। বেলাশেষে চারিদিকে প্রকৃতির বৈকালিক সজ্জার আয়োজন চলেছে। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে বিকালের দিকে আমরা শ্রীনগরে এসে পৌঁছলাম। রাতের মত আস্তানা শ্রীনগরেই। কাল ভোরে আবার যাত্রা সুরু হবে। কারণ রাত্রে এই পার্বত্য পথে বাস চালানো সম্ভব নয়। তাই সব বাসকেই সন্ধ্যার আগে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে থামাতে হয়। বাসের এই থামার জন্যে পিপুলকুঠি থেকে কোটদ্বার পর্যন্ত দীর্ঘপথ একটানা বাস ভ্রমণটা একঘেয়ে লাগে না। শ্রীনগরে বাস এসে থামতেই যাত্রীরা যে যার আস্তানার দিকে চলে গেল। পঞ্চাও নামলো বাস থেকে। আমরা দু'জনে উঠলাম বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে একটা হোটেলে। এখানে শুধু রাতটুকুর জন্যে থাকা।

রাত প্রভাত হতেই আবার যে যার বাসে এসে বসি। পঞ্চা এবার গাড়োয়াল ফ্লাইং বার্ডের যাত্রী হয়েছে। দু'বন্ধুতে একসঙ্গে চলেছি। সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বাসগুলো এক এক করে স্টার্ট নিয়ে পার্বত্য পথে ধূলার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে ছুটে চললো কোটদ্বারের দিকে।

এবার কিন্তু আমরা চলেছি ভিন্ন পথে। রাজধানী পৌড়ি হয়ে আমাদের গিয়ে পৌঁছতে হবে কোটদ্বার রেল স্টেশনে। শ্রীনগর থেকে অপর পথটি চলে গিয়েছে কীর্তিনগর হয়ে হৃষীকেশ পর্যন্ত। বিমল ঐ পুরানো পথ দিয়েই ফিরেছে। আমাদের দু'জনের বরাবরের ইচ্ছা, নতুন পথে ফিরবো। যাওয়ার পথে গাড়োয়ালের নতুন রাজধানী পৌড়িকেও দেখে যাব। শ্রীনগর থেকে রাজধানী পৌড়ির বাসপথের দূরত্ব হলো উনিশ মাইল আর পাকদণ্ডি পথে হেঁটে গেল দূরত্ব পড়ে ন'মাইল।

চড়াই-উৎরাই করতে করতে উনিশ মাইল পার্বত্যপথ ঘুরে ঘুরে বাসগুলো এক এক করে এসে থামলো জনকলোহল মুখরিত রাজধানী পৌড়ি শহরে। দোকান, বাজার, হাসপাতাল, কাছারীবাড়ী, লাইব্রেরী, স্কুল, মাধ্যমিক কলেজ, সংস্কৃত স্কুল, থানা, ডাক ও তারঘর, ধর্মশালা, ডাকবাংলা ইত্যাদি সবই গড়ে উঠেছে গাড়োয়ালের নতুন পার্বত্য রাজধানী পৌড়ি শহরে। পৌড়ি শহরের উচ্চতা ৫,৩০০ ফিট। পার্বত্য রাজধানী হিসাবে পৌড়ি বেশ সুন্দর শহর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট রাজধানী পৌড়িতে অতিবাহিত করে আমরা চলেছি নীচে, আরো নীচের দিকে। নারায়ণ নদীর পুল পার হয়ে বেলা এগারোটার সময় বাসগুলো আবার এসে থামলো সাতপুলি নামক এক প্রশস্ত জায়গায়। নীচের বাসগুলো এসে না পৌছনো অবধি ফিরতি পথের বাসগুলোকে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ সব পথই 'ওয়ান ওয়ে'। সাতপুলিতে দোকান, হোটেল সবই আছে। ফিরতিপথের সব যাত্রীই. এখানে দিবাহার সেরে নেয়। নারায়ণ নদীর তীরে সাতপুলি বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। মধ্যপ্রদেশের সরকারের পুর্তবিভাগ সাতপুলির নারায়ণ নদীতে একটি ড্যাম তৈরী করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে নীচের বাসগুলো এক এক করে পৌঁছে গেল সাতপুলিতে। উপরে বাসের ড্রাইভাররা হর্ণ বাজিয়ে ছড়িয়ে পড়া যাত্রীদের একত্র করে আবার এক এক করে স্টার্ট দিলো! ছিলাম স্বর্গ রাজ্যে এইবারে ফিরছি মর্ত্যলোকে। বাস যত নীচের দিকে নামতে লাগলো ততই গরম অনুভূত হতে লাগলো। বোধ করি গরমের জন্যে এদিকে পানীয় জলের খুবই অভাব। সেই কারণে সরকার থেকে পথের মাঝে মাঝে জলছত্রের বন্দোবস্ত করে রেখেছে। বাস তাই সময় সময় ঐ সব জলছত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন তৃষ্ণার্ত যাত্রীরা জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় বাসগুলো এসে থামলো কোটদ্বারে। এখানেই বাসের শেষ গতিবিধি। বাস থামতেই যাত্রীর দল কেদার-বদরিকে স্মরণ করে মহোল্লাসে হুঙ্কার ধ্বনি দিতে দিতে মুহূর্ত মধ্যে বাস ফাঁকা করে কোটদ্বার স্টেশনে আশ্রয় নিলো। শ্রীনগর থেকে কোটদ্বারের দূরত্ব পঁচাশি মাইল। এই সুদীর্ঘ পথ বাসে করে অতিক্রম করতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে উনিশ ঘণ্টা। এই সঙ্গেই কেদার-বদরির পথের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম আমরা। যে পথে কেটেছে আমাদের অনেকগুলো দিন রাত, আনন্দবেদনার অনেকগুলো মুহূর্ত, সেই পথের শেষে এসে মনটা কেমন করে উঠলো। এবার যাত্রা রেলপথে তাই আর একবার ফিরে তাকালাম ফেলে আসা পাথর ছড়ানো পথের দিকে।

. ট্রেন ছাড়বে বিকেল পাঁচটায়। হাতে এখনো অনেক সময় বাকি। ট্রেণ ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে টিকিট দেওয়া হবে। কোটদ্বার থেকে নাজিবাবাদ হয়ে ডুন এক্সপ্রেসে ফিরব কলকাতায়। বুকিং অফিস খুলতেই আমরা ছু'খানা নাজিবাবাদের টিকিট কেটে নিলাম। এখানে সরাসরি হাওড়া পর্যন্ত টিকিট পাওয়া যায়। কেবল নাজিবাবাদে একবার ট্রেণ বদল করতে হয় এই যা।

কোটদ্বার থেকে নাজিবাবাদের দূরত্ব হলো পনেরো মাইল। বিকেল পাঁচটার সময় কোটদ্বার থেকে ট্রেণ ছাড়ার সময় তীর্থযাত্রীর দল শেষ বারের মত কেদারনাথ ও বদরিনাথজীর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। ট্রেণ ছুটে চলেছে নাজিবাবাদ স্টেশনের দিকে। হিমরাজ্য থেকে নেমে এসেছি সমতল ভূমিতে, চারিদিকের গরম আবহাওয়ায় যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। কোটদ্বার থেকে নাজিবাবাদ পৌঁছতে সময় লাগলো এক ঘণ্টা মাত্র। নাজিবাবাদে পৌঁছে সেই রাতেই ডুন এক্সপ্রেসে রওনা হলাম সোজা কলকাতা।

সতেরো দিন ধরে হিমালয়ের তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি। ছু'চোখ মেলে দেখেছি তার পাগল করা রূপ—ছু'কান ভরে শুনেছি

স্বর্গধারা মন্দাকিনী, অলকানন্দার কলতান, দু'হাতে কুড়িয়েছি চারিদিকে ছড়ানো প্রকৃতির অজস্র সম্পদ। পথের দু'পাশে ফুটে থাকা রাশি রাশি বিচিত্র ফুলের সুবাস গ্রহণ করেছি প্রাণভরে—পথের উপর থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি পথচারী তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন হাসিকান্না, আনন্দবেদনার টুকরোগুলোকে। মন্দিরে মন্দিরে পূজা করেছি দেবতাকে—সূর্যোদয় থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের তলায় তাঁরই অর্ঘ্য সাজিয়েছি অন্তরের ভক্তি উপচার দিয়ে। নানা সঞ্চয়ের ভারে ভারি হয়ে উঠেছে স্মৃতির মঞ্জুষা। তবুও দুর্বার আকর্ষণে হিমালয় টেনেছে আমায় বারে বারে। তাই ফিরে ফিরে গিয়েছি আবার তার কোলে—কিন্তু হিমালয় দেখার তৃষ্ণা আজও আমার মেটেনি—হয়ত এ জীবনে মিটবেও না।